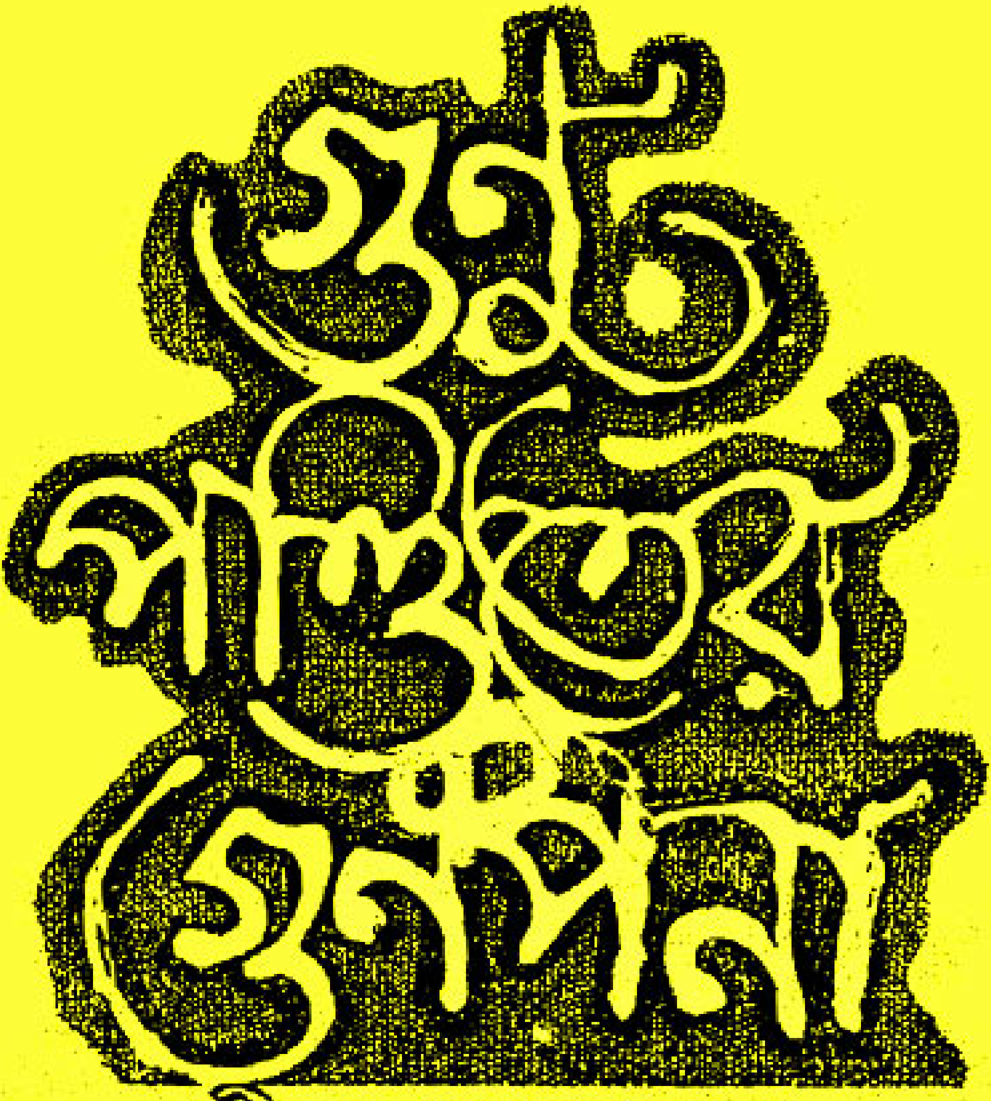

লীলা মজুমদার

গুণুপণ্ডিতের গুণপনা

আমার পিসিমা ভীষণ ভালো হলেও বেজায় ভীতু। সব জিনিসে তাঁর ভয়। যেখানে যা আছে তাতে ভয় আছেই, আবার অনেক জিনিস নেই তাকেও ভয়। বড়োদিনের ছুটিতে একবার গেছি তাঁর বাড়িতে। মফঃস্বল শহর। খাবার-দাবারের ভারি সুবিধা। হপ্তায়, হপ্তায় ধোপা আসে, কুড়ি টাকা মাইনেতে এক্সপার্ট চাকর পাওয়া যায়। বাড়ির সামনে এবং পিছনে নিজেদের বাগান, দু-পাশে পাশের বাড়িগুলোর বাগান; সামনে ডাক্তারের বাড়ি। মোড়ের মাথায় সিনেমা। খেলার মাঠে প্রতি বছর এই সময় গ্রেট সরোজিনী সার্কাসের তাঁবু। তাছাড়া ওখানকার প্যাঁড়া আর ক্ষীরের পান্তুয়া বিখ্যাত। আর এন্তার মুরগি পাওয়া যায়। এমন জায়গা ঝপ্ করে বড়ো একটা দেখা যায় না।

সন্ধ্যার আগেই ট্রেন থেকে নেমেছি। শিরশির করে গাছের পাতার মধ্যে দিয়ে হাওয়া বইছে। ঠং ঠং করে কোথায় একটা কাঠঠোকরা গাছ ঠোকরাচ্ছে। লোকের বাড়িতে উনুনের আঁচ পড়ছে। পিসিমার গেটের ওপরে থোকা থোকা ফুল ফুটেছে। সেদিন রাত্রে যখন বড়ো খাটের পাশে আমার ছোটো নেওয়ারের খাটে লেপ মুড়ি দিয়ে শুলাম, তখন খালি মনে হচ্ছিল দশ দিনের বদলে যদি এক-শো দিন থাকতাম কী মজাটাই-না হত।

কিন্তু সেকেলের কোনো এক ঋষি যে কথা ভূর্জপাতার খাতায় খাগের কলমে লিখে গেছেন যে এ পৃথিবীতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ বলে কিছু হয় না, সেটা ঠিক। পরদিন ভোরে পিসিমার সঙ্গে নীচে নেমেছি। পিছনের বারান্দার জালের দরজার ছিটকিনি খুলে গয়লানীর কাছে আমার জন্যে বেশি করে দুধ নেওয়া হচ্ছে, এমন সময় গয়লানী বললে, 'তালার ব্যবস্থা করুন মা। জালের ফোকর দিয়ে হাত গলিয়ে এ দরজাটা খুলে ফেলতে দুষ্ট লোকের কতটুকু সময় লাগবে!'

পিসিমা বললেন, 'কী যে বলিস বাতাসি, শুনলেও হাত-পা কাঁদে।' বাতাসি বললে, 'না, বালানগড়ের জেলখানা থেকে গুণুপণ্ডিত পালিয়েছে কিনা তাই বলছিলাম।'

গুণুপণ্ডিতের নাম শুনেই পিসিমার বুক কেঁপে উঠল তবু জোর করে হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, তুইও যেমন, কী আর এমন সোনাদানা আছে আমার ঘরে যে জেলভাঙা ডাকাত ধরা পড়বার ভয় ভুলে, আমার বারান্দার ছিটকিনি নামাবে?'

দুধের ক্যানাস্তারা নামিয়ে সিঁড়ির উপর বসে পড়ল বাতাসি। আমার দিকে তাকিয়ে এতটা গলা নামিয়ে যাতে স্পষ্ট আমি শুনতে পাই, বললে— 'আহা সোনাদানা নয়, ওনাদের দল আছে, তারা ছেলেধরা করে নিয়ে যায়। তারপর বেনামি চিঠি দেয় সুঁদরিবনের কালী-মন্দিরের পেছনে বটতলাতে হাজার টাকা পুঁতে এসো তবে ভাইপো ফিরিয়ে দেব। না দিলে—' এই বলে বাতাসি এমনভাবে চুপ করল যে পিসিমা কেন, আমারি গা শিউরে উঠল।

বারান্দার কোনায় কাঠের টেবিলে বড়ো স্টোভে পিসিমার বুড়ো চাকর হরিন্দম চায়ের জল ফুটোচ্ছিল, সে এবার বেরিয়ে এসে বললে, 'আর ভয় দেখাবার জায়গা পাসনি বাতাসি? ও ছেলেকে কেউ নিয়ে গেলে ফেরত দেবার জন্য পয়সা চাইবে না, বরং পয়সা দিয়ে ফেরত দেবে।'

বাবা বলেন হরিন্দম বলে নাম হয় না, অরিন্দম হবে। মনে হতেই বললাম কথাটা। শুনে হরিন্দমের কী রাগ! বললে, 'হ্যাঁ, আমার বাবা নাম রাখল হরিন্দম আর ওনার বাবা তার চেয়ে বেশি জানেন! তাও যদি তাকে দাদামশায়ের কাছে কানমলা খেতে না দেখতাম!'

পিসিমা রেগে গেলেন— 'ওসব কী শেখাচ্ছ বাপকে অশ্রদ্ধা করতে, হরিন্দম?'

হরিন্দম বললে— 'হরি মানে ভগবান, তা ভগবানের নাম এনাদের সব আজকাল ভালো লাগবে কেন? অরিন্দম আবার একটা নাম হল?'

বাতাসি হেসে দুধের ক্যানেস্তারা নিয়ে উঠে পড়ল। যাবার আগে বলল— 'দুধ নেবার সময় দারোগাবাবুর মা বললেন, গুণুপণ্ডিত এদিককার ছেলে নয়, কড়িগাছায় ওদের সাত পুরুষের বাস। সেখানেই পুলিশ আগে যাবে গো মা, কাজেই সেদিকে না গিয়ে আগে এদিকেই তার আসা! পরে গোলমাল চুকে গেলে পর এই তিন ক্রোশ পথ পেরিয়ে গুটি গুটি হয়তো মায়ের সঙ্গে দেখা করে যাবে। এ আমার দারোগাবাবুর মার মুখ থেকে শোনা মা, তাই বলে গেলাম।'

বাতাসি গেলে পর রুটি টোস্ট, ডিমভাজা, চিনি দিয়ে কালকের দুধের সর, এই সব আমাকে দিতে দিতে হরিন্দম আমাকে বললে— 'বাতাসির যেমন কথা! তালা-চাবিতে গুণুপণ্ডিতের কী করবে! মস্ত বড়ো পণ্ডিত সে, নানারকম মন্ত্র জানে, কী একটু পড়ে দেবে, তালা আপনা থেকে খুলে যাবে।'

পিসিমা চটে গিয়ে বললেন— 'পণ্ডিত না আরও কিছু, ঠ্যাঙাড়ে গুন্ডা বল।'

ঠিক এই সময় পিসেমশাইও নেমে এসে চায়ের টেবিলে বসে বললেন— 'কে ঠ্যাঙাড়ে গুন্ডা?'

পিসিমা তাকে খাবার দিতে দিতে বললেন— 'গুণুপণ্ডিত নাকি কয়েদ ভেঙে ফেরারি হয়েছে! বাতাসি বলছিল এমুখো হবার সম্ভাবনা, দারোগার মা নাকি বলেছে।'

ডিম খেলে পিসেমশাইর হেঁচকি ওঠে, তাই সকালে পাঁউরুটি সাদা মাখন দিয়ে জেলি দিয়ে খান। তাতে এই বড়ো একটা কামড় দিয়ে বললেন— 'একেবারে বাঘা ডাকাত ওই গুণুপণ্ডিত, বুঝলি গুন্মি! প্রাণে এতটুকু ভয়ডর নেই, যা করবে ঠিক করেছে তা করবেই, মেরে ধরে ঠেঙিয়ে, বোকা বানিয়ে যেমন করে হোক। ভাবতে পারিস সরকারি গুদোম থেকে পাঁচ হাজার মন ধান একসারি গোরুর গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে কেটে পড়ল। বলল নাকি দিল্লি থেকে হুকুম হয়েছে গাঁয়ে বিলি হবে। সাতদিন বাদে খোঁজ হল। তাও ধরা পড়ত না, শুধু চৌকিদারটাকে দেরি করে তালা খোলার জন্যে টেনে এক চড় কষিয়েছিল, সেই রেগে-মেগে ধরিয়ে দিলে। একটা মুখোশ পর্যন্ত পরে আসেনি এমনি সাহস।'

পিসিমা চায়ের পেয়ালায় ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে বললেন— 'বাঃ তুমি দেখছি গুণুপণ্ডিতের ভারি ভক্ত হয়ে উঠেছ! তার প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ।'

সামনের বাড়ি থেকে ডাক্তারবাবুর ভাই শৈলবাবু মাঝে মাঝে গল্প করতে আসেন। তিনি নাকি ছোটোবেলায় একবার খুব বাতে ভুগেছিলেন বলে কাজকর্ম সে-রকম করতে পারেন না, পিসিমা বলেন। শৈলবাবু বললেন— 'সাংঘাতিক লোকটা, একটু কিছু করার ঠিক করলে কেউ ঠেকাতে পারে না। সে নাকি অনেক রকম ভেল্কি জানে। কার যেন বন্ধ সিন্দুক থেকে হিরের আংটি বের করে নিয়েছিল সিন্দুক না খুলেই। খুব সাবধানে থাকবেন বউদি।'

মাছ বিক্রি করতে ঘনশ্যাম এল। সেও বললে— 'বাবা! সাবধানের মার নেই, ছেলেপুলে নিয়ে রয়েছেন মা!' পিসিমা বিরক্ত হয়ে বললেন— 'পুলিশ দারোগা ডিটেকটিভ সবাই লেগেছে, আজ সন্ধ্যের আগেই তাকে ধরে ফেলবে দেখিস। কেন মিছিমিছি ভয় দেখাচ্ছিস বল দিকিনি?'

ঘনশ্যাম বললে, 'ধরা কি অতই সহজ মা? থানে থানে নাকি তার আস্তানা আছে। এক-এক জায়গায় এক-এক নাম, এক-এক চেহারা। তুড়ি মারতেই ভোল বদলে ফেলে, এই একরকম দেখছেন, এই দেখবেন অন্যরূপ!', লোকে বলে এমনিতে হয় না, তুক করে।'

বেলা যতই বাড়তে থাকে সবার মুখে ওই এক কথাই ফেরে— গুণুপণ্ডিত জেল ভেঙেছে। সে নাকি প্রতিজ্ঞা করেছে সেই চৌকিদারের ধড় আর মাথা এক জায়গায় থাকতে দেবে না। মজা হয়েছে যে চৌকিদারটাও চাকরি ছেড়ে কোথায় গিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে কেউ জানে না। সবাই বলছে তাকে খুঁজে বের না করে নাকি গুণুপণ্ডিত ছাড়বে না। এদিকেই নাকি সব জায়গায় আঁতিপাঁতি করে খুঁজবে। তাছাড়া সরেজমিনে বমাল সমেত ধরা পড়েছিল, গুণুপণ্ডিতের আপাতত কিছু রোজগারপাতির দরকার পড়েছে। কাজেই সবাই সবাইকে সাবধান করে দিতে লাগল। মাঝখান থেকে আমার ছুটিটাই-না মাটি হয়। পিসিমা ঘনশ্যামকে সঙ্গে করে একটু পরেই দারোগা-গিন্নির কাছে খবর সংগ্রহ করতে গেলেন। ফিরলেন সেই বেলা এগারোটার পর। তখন আর আমার মাছের চপের সময় রইল না, এমনি ঝোল খেতে হল। পিসিমা দু-টো বড়ো বড়ো মাছ ভাজাও আমার পাতে দিয়ে বললেন— 'একা একা মোটে বেরুবে না, কেমন বাবা? সাংঘাতিক দুর্ধর্ষ ডাকাত, দু-একটা ছোটো ছেলেকে নিখোঁজ করে দেওয়া ওর কাছে কিছুই নয়।'

শুনে আমার হয়ে গেছে, কবে থেকে কত আশা করে আছি। বললাম, 'তবে কি ঘোষদের পুরোনো পুকুরে মাছ ধরতে যাব না?' পিসিমা ভয়ে চিৎকার করে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'ও বাবা! ও কথা মুখে আনিস নে, তোকে ডুবিয়ে দিয়ে কাদার মধ্যে ছিপ পুঁতে ফেলতে কতক্ষণ! কথা দে, পুকুরে যাবিনে। বিকেলে মাংসের শিঙাড়া করব।'

ছাপাখানার বটকেষ্টবাবু তাঁর এক গেরুয়া-পরা গুরুভাইকে সঙ্গে নিয়ে এলেন দুপুরে খাওয়ার আগে। পিসেমশাইয়ের সঙ্গে তার বেজায় ভাব, তাঁদের দেখে পিসেমশাই লাফিয়ে উঠে বললেন— 'বাঃ বটকেষ্ট করমবাবা তো আমারো গুরু, ইনি তাহলে আমারো গুরুভাই।'

বটকেষ্টবাবু ভারি চিন্তিত মুখ করে বললেন, 'সেইজন্যই তো বনমালী ভাইজীবনকে তোমার কাছে আনলাম ঘেঁটু, গুরুদেবের কাজ করে বেড়ায়, যেমন যেমন জোটে তাই খেয়ে শরীরের কী হাল হয়েছে দেখছ? তাই গুরুদেব চিঠি দিয়ে শরীর সারাবার জন্যে ওকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। পোড়াকপাইল্যা এদিকে আমার বাড়ি থেকে জানোই তো দশদিনের আগে তোমার বউদির বোনেরা নড়বে না!'

আর বলতে হল না। আমার সামনেই গেরুয়া-পরা ভদ্রলোকের এ বাড়িতে থাকার সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। দোতলার ভালো ঘরটা তাঁর জন্য ছেড়ে দেওয়া হল। পিসিমা আর আমি নীচে নেমে এলাম। তবে একটু সুবিধেও হয়ে গেল, ভদ্রলোকের নাকি দুধ, ঘি, মুরগি, ছানা, ডিম এই সব পথ্যি! তার মানেই পিসিমা আমাকে সমান ভাগ দেবেন।

বটকেষ্টবাবু উঠে পড়ে বললেন, 'ইয়ে, কী বলে, ঘেঁটু, বনমালী ভাইজীবন আবার একটু নার্ভাস প্রকৃতির, দরজাটরজাগুলো তোমাদের যেন বড়ো লটখটে মনে হয়, একটু ভেতর থেকে তালার বন্দোবস্ত করে নিলে ভালো হয়—'

আমি বললাম, 'ঘনশ্যাম বলেছে তালার কম্ম নয়, সে তুক করে তালা খোলে।'

শুনে বনমালী ভাইজীবন ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন— 'তুক-তাকে যোগ দেবার যে আমার গুরুদেবের বারণ আছে।'

বটকেষ্টবাবু হেসে উঠলেন, 'আহা, তুমিও যেমন, ওসব মুখ্যুদের বাড়ানো কথা। তুক না আরও কিছু, গুদোমের তালা সে কি চৌকিদারকে দিয়ে খোলায়নি বলতে চাও? সাবধানে থেকো সবাই; তবে হয়তো দেখবে কালকের মধ্যেই ধরা পড়ে গেছে। এখানে কোনো ভয় নেই।'

বনমালীবাবু ভয়ে ভয়ে উঠে পড়ে বললেন, ‘মানে, ভয় পাই না ঠিক, তবে আমার ছোটোবেলা থেকে বুক ধড়ফড়ের ব্যারাম আছে কিনা।’ তাঁকে অনেক আশ্বাস দিয়ে বটকেষ্টবাবু গেলেন। ঠিক হয়ে গেল বনমালীবাবু আর সিঁড়িটিড়ি ভাঙবেন না, খাবার-দাবার স্নানের জল সব দোতলায় পৌঁছে দেওয়া হবে। বাবা! তাঁর ভয় দেখে বাঁচি না, পিসিমাকেও হার মানিয়েছেন!

দুপুরের খাওয়াটা ঠিক সে-রকম জমল না। পিসিমারা ওঁকে নিয়েই ব্যস্ত তা আমাকে দেখবেন কী! আর হরিন্দম বললে নাকি বেশি মাছের বড়া খেলে পেট কামড়ায়! এদিকে শীতের দুপুরে চারদিক অন্ধকার করে বেশ মেঘ জমেছে, কনকনে হাওয়া বইছে। এমন দিনে কি ঘরে বসে থাকা যায় কখনো? ওদিকে পুরোনো পুকুরে মাছ ধরতে পিসিমার বারণ! অবিশ্যি স্টেশনের নতুন পুকুরের কথা তো কিছু বলেননি। দুপুরে সবাই ঘুমুলে যেন আরও অন্ধকার করে এল, সেই সময় মাছরা সব ঘাঁই মারে। ছিপটা নিয়ে গুটি গুটি পিছনের বারান্দার তারের দরজা খুলে যেই-না আতা বাগানে ঢুকেছি, দেখি আতা গাছের তলায় সে দাঁড়িয়ে আছে।

কী আর বলব! আরেকটু হলে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলাম। চিনিয়ে দেবার দরকার নেই, দেখলেই চেনা যায়, ছ-ফুট লম্বা তাগড়া জোয়ান, এতখানি বুকের ছাতি ইটের মতো শক্ত, পায়ের গুলিতে হাতুড়ির বাড়ি মারলেও কিছু হবে না, লাল টকটক করছে দু-চোখ আর একমুখ ঘন দাড়ি, পরনে ঘোর নীল শার্ট আর হাফ প্যান্ট। লুকিয়ে থাকবার পক্ষে এর থেকে ভালো সাজ আর কী হতে পারে?

আমাকে সে আঙুল বেঁকিয়ে ডাকল। বলল, ‘খিদে পেয়েছে, খাবার আন্!’ বললাম, ‘হরিন্দম ডুলিতে তালা দিয়েছে।’

অমনি পকেট থেকে এক গোছা চাবি ফেলে দিয়ে বললে, ‘এই নাকি?’

দেখে আমার গায়ের রক্ত জল! ঢোক গিলে বললাম, ‘তবে কি হরিন্দম আর নেই?’

লোকটা তো অবাক! বলল, ‘কী জ্বালা, বলছি তার পেট ব্যথা, শুয়ে রয়েছে, আমি তার জ্ঞাতি ভাই, খুব ভালো রাঁধি। এখন যাও দিকিনি, ডুলিতে কী আছে আমার জন্যে বের করে আনো।’

অগত্যা তাই দিলাম, আট-দশটা মাছের বড়া পাঁউরুটি দিয়ে সে দিব্যি খেয়ে ফেলল; হয়তো সেগুলো আমারই জলখাবারের জন্য তোলা ছিল। খেয়ে-দেয়ে মুখ চাটতে চাটতে বলল, ‘কী অমন করে তাকাচ্ছ কেন? খিদে পেয়েছিল, খেয়েছি তো হয়েছে কী? যাচ্ছেতাই রান্না হয়েছে বাপু। রাতে এর তিনগুণ ভালো করে রেঁধে দেব দেখো। হরিন্দমের পেট ব্যথা, ও তো আর পারবে না। তোমার মা-বাবাকে বলে রেখো, হরিন্দমের জ্যাঠতুতো ভাই রাঁধবে।’

বললাম, ‘মোটেই আমার মা-বাবা নয়, পিসিমা-পিসেমশাই। তাছাড়া এই যে বললে জ্ঞাতি ভাই?’ লোকটা বিরক্ত হয়ে বলল, ‘ওই একই হল, জ্যাঠতুতো ভাইরা বুঝি জ্ঞাতি ভাই নয়?’

তবু আমার বিশ্বাস হচ্ছে না দেখে একবার আমাকে হরিন্দমের ঘর থেকে ঘুরিয়ে আনল। নাক অবধি কম্বল চাপা হরিন্দম গোঁ-গোঁ করছে। দেখেই আমার হাত-পা পেটে সেঁধিয়েছে! সে হরিন্দমকে বললে, ‘বলো, মাথানেড়ে বলো, আমি তোমার জ্ঞাতি ভাই, তোমার পেট ব্যথা হয়েছে তাই আমি রাঁধব।’

হরিন্দমও তার কথামতো মাথা নাড়ল।

পিসিমাকে হরিন্দমের অসুখের কথা বলে সেই ব্যবস্থাই করা গেল। সত্যি খাসা রাঁধে লোকটা, সবাই খেয়ে মহাখুশি। বনমালীবাবুর চেহারা বদলে গেল, দেখতে দেখতে ছাই রঙের মুখটাতে একটু রং ধরল। আহা, তাই যেন হয়, হরিন্দমের পেট ব্যথা এ দশদিনে যেন না সারে। আমরা খেয়ে বাঁচি।

লোকটা এখন নাম নিয়েছে সখারাম। দিব্যি লেগে গেল হরিন্দমের বদলে রান্নার কাজে। সেই দশদিন পিসিমার বাড়িতে যে কতরকম পরোটা কাবাব কালিয়া ঝালফিরোজি ইত্যাদি চলল আর সে ক্ষীর চমচম, ঘরে তৈরি মালাই যে না খেয়েছে তাকে বলাই বৃথা।

অবিশ্যি আমি ভালো করে কিছু খেতে পারিনি, কারণ আমি জানি সখারাম হল গুণুপণ্ডিত। ভেক্কি দিয়ে রান্না করে। হরিন্দমের মোটেই দশদিন দরে পেটব্যথা হয়নি, গুণু তার মুখে গ্যাগ্ পরিয়ে, হাত-পা বেঁধে কম্বল চাপিয়ে দিয়ে রেখেছে। সব জানি, কিন্তু বলি কোন্ সাহসে? এক নিমেষে সবাইকে কচুকাটা করে ফেলবে না? ব্যাটার এমনি সাহস যে শেষ দিনে রেঁধে বেড়ে পিসেমশাইয়ের বন্ধুবান্ধবদের পরিবেশন করে খাওয়ালে। কেউ কিছু সন্দেহ করল না, খালি বনমালীবাবু যোগীপুরুষ, হয়তো বা মন্ত্রবলে কিছু বুঝে থাকবেন। বার বার ওর দিকে তাকাচ্ছেন দেখলাম। কিন্তু রান্নার সবচেয়ে বেশি প্রশংসা করলেন উনিই আর রোগা পটকা হলে কী হবে, খেলেনও সবচেয়ে বেশি?

খাওয়ার শেষে সবাইকে জাফ্রাণ দেওয়া ক্ষীরের সন্দেশ দেওয়া হচ্ছে, এমন সময় কথা নেই বার্তা নেই, চার-পাঁচজন পুলিশ অফিসার, কনস্টেবল, ইত্যাদি এসে হাজির। তাদের পিছনে হরিন্দমের মুখটা দেখেই আর আমাকে বলে দিতে হল না যে সখারাম রান্নাবান্না নিয়ে আজ মশগুল, এই ফাঁকে কেমন করে দড়া-দড়ি খুলে পালিয়ে গিয়ে হরিন্দম পুলিশ ডেকে এনেছে! কী ফ্যাকাশে রোগা হয়ে গেছে হরিন্দম। এবার আমাদের পোলাও কালিয়া খাওয়াও তা হলে ঘুচল। পুলিশেরা ঘরে ঢুকতেই অবাক কাণ্ড! বনমালীবাবু একটা অস্ফুট চিৎকার করে পিছনের দরজা দিয়ে দৌড় মারলেন। কিন্তু সেখানেও লোক ছিল, দেখতে দেখতে তারা তাঁর হাতে হাতকড়া পরাল। আর সখারাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্ষীর মাখা হাত দিয়েই মাথায় হাত বুলোতে লাগল।

কারো মুখে প্রথম কথা সরে না। তারপর সম্বিৎ ফিরে এলেই পিসেমশাই ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'ওকি হল দারোগাবাবু, বনমালীবাবু আমার গুরু ভাই, আপনি কাকে ধরতে কাকে ধরেছেন।'

দারোগাবাবু বললেন, 'ধরেছি ঠিকই, এই রোগাপটকা লোকটিই সেই বিখ্যাত ডাকাত গুণুপণ্ডিত।'

আমি আঙুল দিয়ে সখারামকে দেখিয়ে বললাম, 'আর ও তবে কে?'

এতক্ষণ পর বনমালীবাবু অর্থাৎ গুণুপণ্ডিত কথা বললেন, 'ও হল চাল গুদোমের চৌকিদার। ওর বুড়ো আঙুলের কালো আঁচিল দেখেই চিনেছিলাম, তবে এত ভালো রাঁধে বলে কিছু বলিনি। কিন্তু এখন তোকে বলছি শোন্।'

বলতে বলতে আমার চোখের সামনে গুণুপণ্ডিতের রোগাপটকা শরীরটা যেন দু-গুণ বড়ো হয়ে উঠল, গলার আওয়াজ থেকে বাজের শব্দ শোনা যেতে লাগল। সখারামের মুখ কাগজের মতো সাদা, হাত-পা ঠক্ ঠক্। গুণুপণ্ডিত বলতে লাগল, 'শোন্ ভালো করে। তিনবছর বাদে আমি জেল থেকে বেরুব। বেরিয়েই যেন দেখি তুই আমার গুরুদেব করম বাবার আশ্রমে রাঁধছিস। এক্ষুনি চলে যাবি সেখানে। ঘেঁটুবাবু, দয়া করে ওর মাইনেটা চুকিয়ে দিন। তিনবছর বাদে ফিরে এসে আমি রিটায়ার করব, বাকি জীবনটা আশ্রমেই কাটাব। তুই যেন হাজির থাকিস, ভালো চাস তো!'

পুলিশ অফিসারদের একজন একটু কেশে বললেন, 'তিনবছর নয় স্যার, সম্ভবত চার, জেল ভাঙার ফল আছে তো।'

গুণুপণ্ডিত চোখ পাকিয়ে বলল, 'ওই একই, তিনেতে চারেতে তফাতটা কী হল শুনি? মনে থাকে যেন সখারাম!'

সখারাম একগাল হেসে হাতজোড় করে বললে, 'আজ্ঞে আমি এখন থেকেই তেনার শিষ্য বনে গেছি। তবে মাইনের কথাটা তেনাকে একটু বলে দেবেন।'

পাখি

ডান পা-টা মাটি থেকে এক বিঘত ওঠে, তার বেশি ওঠে না। কুমু তা হলে কী করে? মাসিরা মাকে বললেন, ‘কিচ্ছু ভাবিসনে দিদি, রোগ তো সেরেই গেছে, এখন ওকে ঝাড়া তিন মাস সোনাঝুরিতে মা-র কাছে রেখে দে, দেখিস কেমন চাঙ্গা হয়ে উঠবে।’

বাবাও তাই বললেন, ‘বাঃ, তবে আর ভাবনা কী, কুমু? তা ছাড়া ওখানে ওই লাটু বলে মজার ছেলেটা আছে, হেসে খেলে তোর দিন কেটে যাবে।’

কিন্তু পড়া? কুমু যে পড়ায় বড়ো ভালো ছিল। তা তিন মাস গেছে শুয়ে শুয়ে, তিন মাস গেছে পায়ে লোহার ফ্রেম বেঁধে হাঁটতে শিখে। আরও তিন মাস যদি যায় দিদিমার বাড়িতে, তবে পড়া সব ভুলে যাবে না?

মা বললেন, ‘আবার পড়ার জন্য অত ভাবনা কীসের, বোকা মেয়ে! লেখাপড়া চিরকালের জিনিস, ওকি কেউ ভোলে নাকি? আমি তো লেখাপড়া ছেড়েছি আজ পনেরো বছর, তবু সব ভুলে গেছি নাকি?’

কিন্তু— কিন্তু— কুমুর চোখে জল আসে। মাসিরা যান রেগে।

‘ও আবার কী বুড়ো ধাড়ি আট বছরের মেয়ের আবার কথায় কথায় কান্না কী? সোনাঝুরি পাহাড়ে দেশ, লোকে বলে পরিদের বাস, কতবার বলেছি না তোকে? তারপর এই সময়ে সেখানে গাছে গাছে নাসপাতি পাকে, গাছের ডাল ফলের ভারে নুয়ে এসে প্রায় মাটি ছোঁয়। ওখানে যাবার জন্য লোকে তপস্যা করে, তোর আবার চোখে জল কীসের? সবেতে দেখছি তোর বাড়াবাড়ি!’

মা বললেন, ‘সত্যি পড়ার জন্য অত ভাবনা কীসের মা? লাটুর বাড়ির মাস্টার তোমাকেও পড়াবেন। এই তিন মাস ভালো করে পড়ে তোমাদের ইস্কুলের বড়ো দিদিমণিকে বললে হয়তো পরীক্ষা করে ওপরের ক্লাসে নিয়ে নিতেও পারেন।’

মাসিরা বললেন, ‘ন্যাকা! বেঁচে উঠেছিস্ এই যথেষ্ট, তা না হয় একটা বছর ক্ষতিই হল, তাতে কী এমন অসুবিধেটা হবে শুনি?’

মেজো মাসি বললেন, ‘আরে বাবা তো আমাদের হেডমিস্ট্রেসের সঙ্গে ঝগড়া করে, আমাদের তিন বোনকেই ইস্কুল ছাড়িয়ে একটি বছর বাড়িতে বসিয়ে রেখেছিলেন, তা আমরা কেঁদে ভাসিয়ে ছিলাম নাকি?’

ছোটো মাসি বললেন, ‘আর কাঁদব কী! ওই সোনাঝুরিতেই ছিলাম সে বছরটা। রোজ রোজ পিক্‌নিক্ পড়াশুনার বালাই নেই, মহানন্দে কেটেছিল সারা বছর তারপর দাদুর তাড়ায় আবার সব ভরতি হলাম। সক্কলের একটা করে বছর নষ্ট হল। কেউ কাঁদিনি।’

পরিদের কথাটা সত্যি মিথ্যা কে জানে, কিন্তু সোনামুনি, হাসি, বড়োটুলু, রত্না সবাই ওপরের ক্লাসে উঠে যাবে, কুমু পড়ে থাকবে, ভাবলেও কান্না পায়। তার চেয়ে মরে গেলে কেমন হত? ধাই মা বলত, বিষ্টির জলের ফোঁটা যেমন করে পুকুরের জলের সঙ্গে টুপ করে মিশে যায়, মরে গেলে মানুষের আত্মা ওই রকম করে ভগবানের সঙ্গে মিশে যায়।

কুমুর বড়ো বোন সীমা রেগে যেত। বলত, 'কী যে বল, সক্কলের আত্মা একসঙ্গে কখনো মিশতে পারে? ও বাড়ির দুষ্টু জগার সঙ্গে ভগবান কখনো মিশতে পারেন? আমরাই মিশি না; ঝোপের আড়ালে বিড়ি খায়, এমনি দুষ্টু ছেলে!'

তবে, ধাই মা নিশ্চয়ই মিশে গেছে। ধাইমা বড়ো ভালো ছিল।

কুমুর চোখ ঝাপসা হয়ে আসে।

সোনাঝুরিতে দিম্মার বাড়ির দোতলার বড়ো ঘরে, মস্ত জানলার ধারে আরাম-চেয়ারে বসে বসে চেয়ে দেখে দূরে একটা বিল, সেখানে হাজার হাজার বৃষ্টির জলে ফোঁটা পড়ছে আর অমনি বিলের জলে মিশে যাচ্ছে। মনে হল জলগুলো যেন নাচছে, লাফাচ্ছে, বড়ো খুশি হচ্ছে। আস্তে আস্তে পা-টা আবার একটু তুলতে চেষ্টা করে কুমু। এমন সময় লাটু এসে ঘরে ঢুকল।

'ও কী হচ্ছে রে? ঠ্যাং তুলছিস কেন? ল্যাংড়ারা বুঝি ঠ্যাং তোলে?'

কুমুর চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল বেরোয়। লাটু বিরক্ত হয়ে বলে, 'ছি, ছি, ছি; ছিঁচকাঁদুনি!' বলে এক দৌড়ে পালায়।

সন্ধ্যে হয়ে আসছে, বৃষ্টি থেমে গেছে, বিলের জল সাদা চক্‌চক্ করছে। দিম্মা বলছেন ওটা সত্যিকার বিল নয়, এখানকার লোকেদের শুকনোর সময় বড়ো জলের কষ্ট, তাই পাথরের ছোটো বাঁধ দিয়ে ঝরনার জল ধরে রেখেছে।

আকাশ থেকে হঠাৎ ছায়ার মতো কী বিলের ওপর নেমে এল। কুমু দেখে ঝাঁকে ঝাঁকে সাদা ফিকে ছাই রঙের বুনো হাঁস ঝুপঝাপ করে জলে নামছে। সন্ধ্যের আগের কম আলোতে মনে হচ্ছে যেন রাশি রাশি শুকনো পদ্মফুল সমস্ত বিলটাকে প্রায় ঢেকে ফেলেছে।

এক ছড়া কী যেন সাদা ফুল হাতে নিয়ে লাটু এসে বললে, 'ওই দ্যাখ্, বুনো হাঁসরা আবার এসেছে। শিকারীদের কী মজা! ইস্, আমার যদি একটা এয়ারগান থাকত! টপটপ্ গুলি করে মেরে, ঠ্যাং ধরে ঝুলিয়ে নিয়ে আসতাম, তাপ্পর ক্যায়সা খ্যাঁট হত, ভেবে দ্যাখ্ একবার। ও কী, চোখ বুজছিস যে?'

দিম্মাও তখন ঘরে এসে বললেন, 'হ্যাঁ, ওদের ওই এক চিন্তা, শুধু খাই আর খাই! ওর বাবাও তাই; পঁচিশ-তিরিশটা করে মেরে আনবে, তারপর ভাজো আর খাও!'

কুমু বললে, 'কোত্থেকে এসেছে ওরা?'

'যেই শীত পড়ে অমনি উত্তরের ঠান্ডা দেশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসে, বাঁধের কাছে দু-তিন দিন বিশ্রাম করে, তারপর আবার দক্ষিণ দিকে উড়ে যায়; শোনা যায়, নাকি সমুদ্রের ওপর দিয়ে আন্দামান অবধি উড়ে যায় কেউ কেউ।'

লাটু কাছে এসে ফুলটা কুমুর খাটে রেখে বললে, 'আবার শীতের শেষে যেই-না দখ্‌নে বাতাস বয়, অমনি ঝাঁকে ঝাঁকে সব ফিরে আসে, সে কথা তো বললে না ঠাকুরমা? দু-দুবার শিকারীরা পটাপট্ গুলি চালায়, আর মজা করে কুড়মুড়িয়ে বুনোহাঁস ভাজা খায়।'

লাটুর কথার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দূরে দুম্ দুম্ করে বন্দুকের গুলির শব্দ হল, আর বুনো হাঁসের ঝাঁক ছেড়ে আকাশে উড়ে খুব খানিকটা ডাকাডাকি করে আবার জলে নামল। দু-তিনবার এই রকম

হল, তারপরে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল, শিকারীরাও ঘরে ফিরল, পাখির ঝাঁক সেদিনের মতো নিশ্চিন্ত হল।

দিম্মার পুরোনো চাকর রঘুয়া কুমু-লাটুর জন্য গরম লুচি, মুরগির স্টু আর কুমুর গলা দিয়ে নামে না! বললে, 'দিম্মা, পাখিরা এখন কী করছে?'

লাটু একগাল লুচি মুখে নিয়ে বললে— 'করবে আবার কী, ডানার মধ্যে মুন্ডু গুঁজে মি-মি কচ্ছে, তাও জানিস নে?'

কুমু ছোটোবেলায় ঘুমোনোকে বলত মি-মি কচ্ছে। তাই নিয়ে লাটুর ঠাট্টা হচ্ছে। কী খারাপ লাটুটা!

আরও রাত হলে ফুটফুটে চাঁদ উঠল। ঘরের ওপাশে লাটু ছোটো একটা নেওয়ারের খাটে শোয়ামাত্র ঘুমে অচেতন, কিন্তু নতুন জায়গায় এসে কুমুর চোখে ঘুম নেই। খালি মনে হয়, জানলার নীচে সরবতি লেবুর গাছে কীসের যেন ডানা ঝট্‌পট্‌ শুনতে পাচ্ছে। খাটের পাশেই জানলা, কিন্তু যাবার আগে কুমুর ঠান্ডা লাগার ভয়ে দিম্মা জানলা বন্ধ করে, ভারী পর্দা টেনে দিয়ে গেছেন। কুমু বিছানা ছেড়ে উঠে পর্দার পেছনে সেঁধিয়ে গেল।

মস্ত জানলার একটা কাঁচ আবার ছোট্ট একটা জানলার মতো আলাদা করে খোলা যায়, তাই দিয়ে মাথা গলিয়ে কুমু দেখতে চেষ্টা করে। চাঁদের আলোয় গাছের পাতা ঝিক্‌মিক্‌ করে, দোলে, নড়ে; কিন্তু কিছু দেখতে পায় না কুমু, শুধু কানে আসে পাখির ডানার ঝট্‌পটানি। কেমন যেন মন কেমন করে, মাকে দেখতে ইচ্ছে করে, আস্তে আস্তে বিছানায় ফিরে এসে বালিশে মুখ গুঁজে কুমু ঘুমিয়ে পড়ে।

পরদিন সকালে জানলা খুলে, পর্দা টেনে দিম্মা চলে গেলে, কুমু জানলা দিয়ে চেয়ে দেখে সরবতি লেবুগাছের পাতার আড়ালে, ডাল ঘেঁষে কোনোমতে আঁকড়ে-পাকড়ে বসে রয়েছে ছোটো একটা ছাই রঙের বুনো হাঁস। সরু লম্বা কালো ঠোঁট দুটো একটু হাঁ করে রয়েছে, পা দুটো একসঙ্গে জড়ো করা, বুকের রংটা প্রায় সাদা, চোখ দুটো একবারে কুমুর চোখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে, কালো মখমলের মতো দুটো চোখ। একদিকের ডানা একটু ঝুলে রয়েছে, খানিকটা রক্ত জমে রয়েছে, সমস্ত শরীরটা থরথর করে কাঁপছে।

পাখিটাকে দেখে কুমুর গলার ভেতরে টন টন করতে থাকে; হাত বাড়িয়ে বলে, 'তোমার কোনো ভয় নেই, কোনো ভয় নেই।'

পাখিটা চোখ বন্ধ করে, আবার খোলে। আরেকটু ডাল ঘেঁষে বসে।

কানের কাছে লাটু বলে, 'ও কী রে, ভোর বেলাতে ল্যাংড়া ঠ্যাং নিয়ে কী হচ্ছে বল দিকিনি।'

চমকে ফিরে, দু-হাত মেলে জানলাটাকে আড়াল করতে চেষ্টা করে, কুমু হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে, 'না, না, ওকে খাবে না।'

লাটু তো অবাক। কী আবার খাবে না? কুমুর কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি মেরে পাখি দেখতে পায়। 'ইস্‌! ডানায় গুলি লেগেছে বেচারার। দাঁড়া, গাছে চড়ে ধরি ওটাকে।'

সিংহের মতো জোর আসে কুমুর গায়ে। দু-হাত দিয়ে লাটুকে ঠেলে বলে, 'কক্ষনো না, কক্ষনো না! ওকে খেতে দেব না!' বলে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে। লাটু ওর খাটের উপর বসে পড়ে বোকার মতো চেয়ে থাকে। তারপর বলে, 'চুন হলুদ দিয়ে বেঁধে দিলে সেরেও যেতে পারে। বলিস্‌ তো ধরে আনি।'

কুমু বললে, 'কিন্তু দিম্মা কী বলবেন?'

'কী আবার বলবেন? বলবেন ছি, ছি, ছি, নোংরা জিনিস ফেলে দে, ওসব কী বাঁচে!'

কুমু জোর গলায় বললে, 'নিশ্চয় বাঁচে, চুন হলুদ দিয়ে ডানা বেঁধে, গরম জায়গায় রাখলে নিশ্চয় বাঁচে।'

লাটু বললে, 'কোন গরম জায়গায়?'

'কেন আমার বিছানায়, লেপের মধ্যে।'

'দেখিস, কেউ যেন টের না পায়।'

'কী করে টের পাবে, আমার বিছানা তো আমি নিজে করি। ডাক্তার আমাকে হাত-পা চালাতে বলেছে যে। আচ্ছা, ধরতে গেলে উড়ে পালাবে না তো?'

'তোর যেমন বুদ্ধি! এক ডানায় ওড়া যায় নাকি?'

'কী খাবে ও, লাটু?'

লাটু ভেবে পায় না খাটের মধ্যে বিছানার ভিতরে কী খাওয়াবে ওকে। তাহলে কী হবে? না খেয়ে যদি মরে যায়!

'এক কাজ করলে হয় না রে কুমু? তোর খাবারের ঝুড়ি দিয়ে, লেবুগাছের ডালে ওর জন্য একটা বাসা বেঁধে দিই, তাহলে ভাঙা ডানা নিয়ে আর পড়ে যাবে না, নিজেই পোকামাকড় ধরে খাবে।'

নিমেষের মধ্যে ঝুড়ি নিয়ে লাটু জানলা গলে একেবারে লেবু গাছের ডালে। ভয়ের চোটে পাখিটা পড়ে যায় আর কী! লাটু তাকে খপ্ করে ধরে ফেলে কিন্তু কী তার ডানা ঝট্‌পটানি, ঠুকরে ঠুকরে লাটুর হাত থেকে রক্ত বের করে দিল। লাটু দড়ি দিয়ে শক্ত করে ঝুড়ি বেঁধে পাখিটাকে আস্তে আস্তে তার মধ্যে বসিয়ে দিল। অমনি পাখিটা আধমরার মতো চোখ বুজে ভালো ডানাটার মধ্যে ঠোঁট গুঁজে দিল।

লাটু সে জায়গাতে নিজের পা কাটার সময়কার হলদে মলম লাগিয়ে দিয়ে, আবার জানলা গলে ঘরে এল। বললে, 'ঠাকুরমার কাছে যেন আবার বলিস্ টলিস্ না। বড়োরা বুনো জানোয়ার দেখলে ভয় পায়। বলবেন হয়তো, ছুঁস না ওটাকে। বলা যায় না তো কখন কী বলেন না বলেন!'

কুমু বালিশের তলা থেকে স্ক্রু দেওয়া নতুন পেন্সিলটা লাটুকে দিতে গেল।

লাটু বললে, 'ধ্যাৎ! বোকা! ঠ্যাং ল্যাংড়া বলে কি বুদ্ধিও ল্যাংড়া না কি!' 'বলে এক ছুটে পালিয়ে গেল।

কুমু পা ঝুলিয়ে খাটে গিয়ে বসল।

পাখিটাও ল্যাংড়া। ওর ডানা ল্যাংড়া। কুমু হাঁটতে পারে না ভালো করে, পাখিটাও উড়তে পারে না। পারলে নিশ্চয় ওই দূরে বিলে ওর বন্ধুদের কাছে চলে যেত। গাছের ডালে খাবারের ঝুড়িতে ডানায় মুখ গুঁজে চুপ করে পড়ে থাকত না। কুমুর পা ভালো হলে কুমুও এখানে থাকত না। কলকাতায় মার কাছে থাকত, রোজ ইস্কুলে যেতে, সন্ধ্যেবেলায় সাঁতার শিখত, পুজোর সময় দৌড় খেলার জন্য রোজ অভ্যাস করত। আর কোনো দিনও হয়তো কুমু দৌড়তে পারবে না। কিছুতেই আর পায়ে জোর পায় না। মনে হয় অন্য পা-টার চেয়ে এটা একটু ছোটো হয়ে গেছে।

আরেকবার জানলার কাছে গিয়ে পাখিটাকে দেখে ভালো করে, ও-ডানাটাকে যে নাড়া যায় না সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। পাখিটা ঝুড়িতে বসে বসে আস্তে আস্তে কালো ঠোঁট দিয়ে বুকের পালক পরিষ্কার করছে। তারপর কিছুক্ষণ ঠোঁটে ভর দিয়ে চুপ করে চোখ বুজে পড়ে থাকল; তারপর আবার চোখ খুলে গাছের ডাল থেকে কী একটা খুঁটে খেল।

কুমু বালিশের তলা থেকে ছোট্ট বিস্কুটের বাক্স থেকে একটুখানি বিস্কুট ছুঁড়ে দিল। পাখিটাও

অমনি যেন পাথর হয়ে জমে গেল। বিস্কুটের দিকে ফিরেও চাইল না। কুমু আবার খাটে এসে বসল, নতুন গল্পের বইটা পড়তে চেষ্টা করল। পনেরো মিনিট বাদে আরেকবার জানলা দিয়ে উঁকি মারল। বুকের পালক পরিষ্কার করতে করতে পাখিটা আবার কী একটা খুঁটে খেল।

কুমু খাটে ফিরে এল। খাটের পাশেই আয়না দেওয়া টেবিল, তার টানা থেকে মেজোমাসির দেওয়া নীল রেশমি ফিতেটা বের করে চুল বাঁধল। বাঃ বেশ তো ফিতেটা। একটা বিস্কুট বের করে মুখে দিল, চমৎকার বিস্কুট, কিস্‌মিস্‌ দেওয়া। আরও খানিকটা বাদে যখন একটা বড়ো খুঞ্চিতে করে রঘুয়া কুমুর জন্য দুধ, পাঁউরুটি, নরম নরম ডিম সিদ্ধ নিয়ে এল, তাতে নুন গোলমরিচ দিয়ে কুমু চেটেপুটে খেয়ে ফেলল। এতটুকু রুটি, একফোঁটা দুধ বাকি থাকল না। রঘুয়া তো মহা খুশি।

'আমি বরাবর বলি বড়োমাকে এখানকার হাওয়াই আলাদা। বলে নাকি কুমুদিদির খিদে হয় না, ওই তো কেমন সব খেয়ে ফেলেছে।'

রঘুয়া চলে গেলে পর ঘরটা আবার চুপচাপ হয়ে গেল। লাটু নীচে মাস্টারমশাই-এর কাছে পড়ছে, দিম্মা রান্নাঘরে, লাটু সকাল সকাল ভাত খেয়ে ইস্কুলে যাবে।

খানিক বাদে দিম্মা উপরে এসে ভারি খুশি।

'এই তো দিদিমণি কেমন চুল আঁচড়ে নীল রিবন বেঁধেছে, খুব ভালো দেখাচ্ছে। আবার খিদেও হয়েছে শুনছি। বাড়িতে নাকি কান্নাকাটি করতে, খেতে না? কেমন ভালো জায়গাটা বলো তো? তাই লোকে বলে এটা পরিদের দেশ। ওই বাঁধটাকে বলে পীরতলা।'

গাছের ডালে পাখিটা একটু নড়ছে চড়ছে, একটু-একটু শব্দ হচ্ছে, কুমু ভয়ে কাঠ, এই বুঝি দিম্মা দেখতে পেয়ে মঙ্গলকে বলেন, ফেলে দে ওটাকে, বড়ো নোংরা, ঝুড়ি খুলে আন, ওটা কে বেঁধেছে ওখানে, ভালো ঝুড়ি!

ঘরের মধ্যে টুকিটাকি কাজ সেরে দিম্মা গেলেন চলে। কুমু জানলা দিয়ে চেয়ে দেখে পাখিটা ডানার মধ্যে মুন্ডু গুঁজে ঘুমিয়ে আছে। কুমুও বই নিয়ে বিছানায় গিয়ে শুল। হঠাৎ জানলার বাইরে সোরগোল। চমকে উঠে দেখে একটা হলদে বেড়াল গাছের ডালে গিয়ে উঠছে। কুমু ভয়ে কাঠ; এই বুঝি বেড়াল পাখি খেল। কিন্তু খাবে কী, অত বড়ো পাখি তার তেজ কত! দিলে ঠুক্‌রে ঠেলে বেড়ালের মুখ থেকে রক্ত বের করে দিয়ে একেবারে ভাগিয়ে। দুটো কাক দূর থেকে মজা দেখল, কাছে ঘেঁষতে সাহস পেল না।

কুমু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ঘরের এ মাথা থেকে ওমাথা হেঁটে বেড়াতে লাগল। খোঁড়া তো হয়েছে কী, এইরকম করে হাঁটলেই না পায়ের জোর বাড়বে। দু-বার হেঁটে কুমু এসে যখন খাটে বসল, পা দু-টোতে ব্যথা ধরে গেছে কিন্তু মনে হচ্ছে যেন ডান পা-টা এক বিঘতের চেয়ে একটু বেশিই তোলা যাচ্ছে।

দিম্মা এলে কুমু বললে, 'স্নানের ঘরে আমার জামা তোয়ালে তুমি ঠিক করে দিয়ো; আমি নিজেই স্নান করব।'

দিম্মা ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'আজ অনেক হেঁটেছ, আজ থাক, দু-দিন বাদে কোরো, কেমন?'

এমনি করে দিন যায়, বুনো হাঁসের ডানা আস্তে আস্তে সারতে থাকে। দু-দিন পরে পাখির ঝাঁক বিল থেকে দক্ষিণ দিকে উড়ে গেল। গাছের ডালে বসে পাখিটা একটা ডানা ঝাপটাতে লাগল। উড়বার জন্য কী যে তার চেষ্টা! কিন্তু ভাঙা ডানা ভর সইবে কেন, হাঁসটা ঝুড়ি থেকে পিছলে পড়ে নীচের ডালের ফাঁকে আটকে থাকল। লাটু তখনো ইস্কুল থেকে ফেরেনি, কুমু করে কী! জানলার ধারে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকল, পাখিটা অনেকক্ষণ। অসাড় হয়ে ঝুলে থাকার পর, আঁচরে

পাঁচরে নিজেই সেই ডালটার উপর চড়ে বসল। লাটু ফিরে এসে আবার ওকে তুলে ঝুড়িতে বসিয়ে দিল। ঠোকরালও একটু সে, তবে তেমন কিছু নয়, ডানায় আবার ঔষুধ লাগিয়ে দিল লাটু।

পরদিন কুমু লাটুর সঙ্গে মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়তে বসল। মাস্টারমশাই উপরে এলেন। কী ভালো উনি, কুমুকে বেশি করে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। বললেন, এমনি মন দিয়ে পড়লে উনি কুমুকে এই তিন মাসে এমন করে তৈরি করে দেবেন যে বছরের শেষে পরীক্ষা দিয়ে কুমু দিব্যি উপরের ক্লাসে উঠে যেতে পারবে।

এমনি করে দিন যায়, রোজ পাখি একটু করে সেরে উঠে, ঝুড়ি থেকে ডালে নামে। আর আনন্দের চোটে কুমুও ঘরময় হেঁটে বেড়ায়, নিজের বিছানা নিজে পাতে, নিজে স্নান করে, জামা কাচে। দুপুর বেলা এক ঘুম দিয়ে উঠে নিজে বসে অঙ্ক কষে। বাড়িতে চিঠি লেখে, 'মা বাবা, তোমরা ভেবো না, আমি রোজ রোজ সেরে উঠছি, আমার নতুন ফ্রকগুলো পাঠিয়ে দিয়ো, রত্নাদের বোলো আমি পরীক্ষা দেব, আমি আরেকটু ভালো হলে নিজে নীচে নামব, এখন রঘুয়া আমাকে রোজ বিকালে কোলে করে বাগানে নামায়, সরবতি লেবু গাছের তলায় বেতের চেয়ারে বসিয়ে দেয়। রাতে আমি নীচে সবার সঙ্গে খাই।'

আরও লিখছিল, 'সরবতি লেবুগাছে একটা বুনো হাঁস থাকে, তার ডানা ভেঙে গেছিল, এখন সেরে যাচ্ছে।' কিন্তু সেটা আবার কেটে দিল, জানতে পেরে যদি দিম্মা পাখিটাকে তাড়িয়ে দেন!

এমনি করে এক মাস কাটল। তার মধ্যে একদিন খুব বৃষ্টি হয়েছিল, পাখিটা তো ভিজে চুপ্পুড়। ঝুড়ি ঝেড়ে ঝুড়ির তলার গাছের ডালের আড়ালে গিয়ে সেঁধুল। তারপর বৃষ্টি থেমে আবার যখন রোদ উঠল দিব্যি ডানা মেলে পালক শুকোল। কুমু অবাক হয়ে দেখল ডানা সেরে গেছে।

তার দু-দিন পরে পাখিটা উড়ে গেল। দুপুরে শুকনো ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে, মাথার অনেক ওপর দিয়ে মস্ত এক ঝাঁক বুনো হাঁস তিরের মতো নক্‌শা করে উড়ে গেল। কুমুর পাখিও হঠাৎ কী মনে করে ডাল ছেড়ে অনেকখানি উঁচুতে উড়ে গেল, কিন্তু তখুনি আবার নেমে এসে মগডালে বসল। হাঁসরা গিয়ে পরি তলায় নামল। পাখি সেই দিকেই চেয়ে থাকল।

সারা রাত বুনো হাঁসরা বিশ্রাম করে পরদিন সকালে যখন দল বেঁধে আকাশে উড়ল, কুমুর পাখিও তাদের সঙ্গ নিল। দল থেকে অনেকটা পেছিয়ে থাকল বটে, কিন্তু ক্রমাগত যে রকম উড়তে লাগল, কুমু-লাটুর মনে কোনো সন্দেহ রইল না, এখুনি ওদের ধরে ফেলবে।

সে বিকেলে কুমু নিজে হেঁটে নীচে নামল, ডান পা-টা যেন একটু ছোটোই মনে হল।

কুমু বলল, 'দিম্মা, পা-টা একটু ছোটো হলেও কিছু হবে না, আমি বেশ ভালো চলতে পারি, বুনো হাঁসটারও একটা ডানা একটু ছোটো হয়ে গেছে।'

শুনে দিম্মা তো অবাক! তখন লাটু আর কুমু দু-জনে মিলে দিম্মাকে পাখির গল্প বললে। দিম্মা কুমুর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'ওমা, বলিসনি কেন, আমিও যে পাখি দেখতে ভালোবাসি!'

ম্যাজিক

ছোটোবেলায় প্রায়ই আমাদের চাকর বলত পাশের বাড়ির বড়ো বাবুর্চি নাকি জাদু জানে; নাকি সাহেবের খানার জন্য এই মোটা মোটা মুরগি এল, তা সে সাহেব তো চোখে দেখল ছাই, বাবুর্চির হল পেট পুজো! কিন্তু ওমা! খাবার সময় ঠিক থালা ভরা ভুরভুর গন্ধ লালচে ভাজা মোগলাই মুরগি! বাবুর্চির মাইনেও বাড়তে থাকে উত্তরোত্তর! তাই দেখে আমাদের চাকরটার সে কী হিংসে! সেও নাকি পাহাড়ের উপরে দেওতাস্থানে গিয়ে সাদা মুরগি বলি দিয়ে জাদুমন্ত্র শিখে আসবে, তাহলে সে ইচ্ছেমতো বেড়াল হতে পারবে, কারো বাড়িতে কাজ করতে হবে না, হেনা-তেনা কত কী!

তাই শুনে আমাদের বুড়ি ঝি বলত, ওমা, এ আবার কী! আমার দাদামশাই মুখের মধ্যে প্যাঁচার চোখের মণি পুরে, বেমালুম অদৃশ্য হয়ে যেত, আর তাকে চোখে দেখা যেত না, যেখানে খুশি আসত, যেত, কেউ টেরও পেত না।

আমরা বলতাম, কোথায় সে এখন, আমরা অদৃশ্য হওয়া শিখব! বুড়ি বলত ওমা, এরা আবার কী বলে! বলি, সে কবে না খেতে পেয়ে পটল তুলেছে, তার কাছে আবার শিখবে কী!

আমাদের পাশের বাড়ির মাসিমারা একবার রাঁচি গিয়ে সাধুদের দেখেছিলেন, গন্‌গনে আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে পায়ে একটু ফোস্কা পর্যন্ত পড়ে না। তা সে নাকি জাদু নয়। বার বার স্নান করে করে শরীরটাকে আগুন-সই করে নেয় ওরা। কিন্তু ওই মাসিমাই নাকি ছোটোবেলায় জাদুকর দেখেছিলেন, তারা চোখের সামনে আমের আঁটি থেকে গাছ বের করে, গাছ বড়ো করে, তাতে বোল ধরিয়ে, ফল পাকিয়ে, সকলকে পেট ভরে খাইয়ে দিয়েছিল।

ছোটোবেলা থেকে এমনি সব ম্যাজিকের গল্প শুনতাম আমরা। সেকালের সাহেবদের বইতে প্রায়ই আরেকটা এদিশি ম্যাজিকের কথা পড়া যেত, সেও ভারি অদ্ভুত। জাদুকর মোটা একগাছি দড়ি মাটিতে ফেলে, সাপ খেলাবার বাঁশি বাজাতে শুরু করে অমনি দড়ি গাছাও সাপের মতো কিলবিলিয়ে ফণা ধরে ওঠে। তারপর সোজা হয়ে আকাশে উঠতে থাকে; শেষ পর্যন্ত দড়ি খাড়া হয়ে স্থির হয়ে যায়। উপরটায় একটু মেঘের মতো জমা হয়ে থাকে, তার উপরে দেখা যায় না।

তখন একটা লোক ছুটে এসে দড়ি বেয়ে উপরে উঠে মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়। আর অমনি আর একটা লোকও তলোয়ার হাতে তাকে তাড়া করে দড়ি বেয়ে উঠে পড়ে সেও অদৃশ্য হয়ে যায়। শূন্যের উপরে খুব খানিকটা মারামারির শব্দ হয়, উপর থেকে এটা ওটা, পাগড়ি, নাগরাই

ইত্যাদি নীচে পড়তে থাকে। শেষ অবধি জাদুকর আবার বাঁশির সুর বদলে দড়ি গুটিয়ে আনে। যেই বাঁশি থামে, দড়িগাছিও ভালো মানুষের মতো দড়িগাছি হয়ে মাটিতে শুয়ে থাকে।

আর সেই লোক দুটো? তারাও খানিক বাদে ঘাম মুছতে মুছতে অন্যদিক থেকে এসে যে যার পাগড়ি, চটি পরে নেয়।

এই ম্যাজিক দেখবার জন্যে সেকালের সায়েবরা ছিল পাগল। অথচ এখন কেউ এর নামও করে না।

বড়োরা বলতেন ম্যাজিক ফ্যাজিক কিছু নয়, সব বুজরুকি, হাতছাপাইয়ের ব্যাপার— যাকে বলে চোখে ধুলো দেওয়া, সে ছাড়া আর কিছু নয়।

একবার ছেঁড়া-খোঁড়া কাপড় পরা একটা লোক এল। এসে বলল সে এক টাকাকে দু-টাকা করে দেবার বিদ্যে জানে। এমনকী নমুনা দেখাবার জন্যে দিলও একটা দশ টাকার নোটকে দুটো দশ টাকার নোট করে। কিন্তু এই জাদু দেখাবার জন্যে তাকে পাঁচ টাকা বখশিস দিতে হবে!

আমাদের জাদু দেখবার খুবই ইচ্ছে ছিল। তা ছাড়া, যার যা টাকাকড়ি আছে, সব দু-গুণ হয়ে যায় তো মন্দ কী! কিন্তু বড়োদের জন্যে আর কিছুই করা গেল না। তাঁরা বললেন, এক টাকাকে যদি দু-টাকাই করতে পারে তো আবার পাঁচ টাকা চায় কেন? নিজের টাকাগুলোকে দু-গুণ, চারগুণ, আটগুণ করে নিলেই তো পারে। এই বলে দিলেন লোকটাকে ভাগিয়ে। ইস্ আমাদের সে যে কী কষ্টই হয়েছিল!

আরও কতরকম ম্যাজিক দেখেছি, হতে পারে হাত সাফাই, কিন্তু অমন হাত সাফাই যার-তার করার সাধ্য নেই। একজন ধুতি-পাঞ্জাবি পরা লোক, দেশলাই কাঠি নাচাত। নিজে দশ হাত দূরে বসত, দর্শকদের কাছ থেকে এক বাক্স দেশলাই চেয়ে, সেটাকে খুলে মাটিতে ফেলে রাখত। তারপর ওই অতদূরে বসে সে যা বলত, দেশলাই কাঠিরা তাই করত। লাইন করে বাক্স থেকে বেরিয়ে মার্চ করত, লাফাত, শুয়ে পড়ত, রাইট অ্যাবাউট্ টার্ন করে আবার গিয়ে বাক্সে ঢুকে পড়ত। করুক তো কেউ এইরকম বুজরুকি! তাকেই আমরা জাদুকর বলতে রাজি আছি।

তবে সবচেয়ে আশ্চর্য ম্যাজিক দেখেছিলাম বত্রিশ বছর আগে, শ্রীনিকেতনের কাছে লাভপুরের রাস্তায়। পুজো সেবার খুব দেরিতে পড়েছিল। পুজোর ছুটির পর যখন আবার ইস্কুল খুলল, তখন বেশ শীত পড়ে গেছে। একদিন আগে এসে পৌঁছে শুনি নাকি শ্রীনিকেতনের কাছে জাদুকরের তাঁবু পড়েছে, সে অদ্ভুত ম্যাজিক দেখাচ্ছে।

গেলাম সবাই দল বেঁধে। তখন সাইকল রিক্‌শা, বাস ইত্যাদির বালাই ছিল না, সন্ধ্যা বেলায় সব হেঁটে মেরে দিলাম। পৌঁছে দেখি এ কেমন জাদুকর, পয়সাকড়ি নেই, তাঁবুর মাথায় এত বড়ো বড়ো ছ্যাঁদা। জাদুকরদের ছেঁড়া, ময়লা কাপ পরনে।

সার্কাসের তাঁবুর মতো ব্যবস্থা, মাঝখানটা ফাঁকা, চারদিকে গোল করে গ্যালারি বানিয়েছে। একটিমাত্র পেট্রোম্যাক্স বাতিতে সবটা আলো হয়ে রয়েছে।

জাদুকররা ছিল তিনজন। কিন্তু আমরা সবাই গোল হয়ে বসামাত্র, সবচাইতে ছোটো যে তাকে বড়োরা দু-জন চেপে ধরে বলল, এ লোকটা ভারি দুষ্টু। একে পুঁতে রাখাই উচিত, নইলে খেল্ দেখাতে দেবে না।

এই বলে কথা নেই বার্তা নেই, ওইখানেই একটা গর্ত খোঁড়াও ছিল, তার মধ্যে ওকে পুরে দিব্যি মাটি চাপা দিয়ে খেল্ শুরু করে দিল। সে-রকম আশ্চর্য খেল্ আর আমি জন্মে দেখিনি, বোধহয় দেখবও না।

বড়ো জাদুকর প্রথমে একটা জঘন্য ময়লা রুমাল বের করে, সকলকে সেটা পরীক্ষা করতে বলল। এমনি নোংরা সেটা যে কারো হাতে ছুঁতে ইচ্ছা করল না, কিন্তু খুব কাছে এনে, টর্চ জ্বেলে, ভালো করে সবাই দেখলাম, একটা সাধারণ অতি ময়লা রুমাল ছাড়া আর কিছু নয়। সেজো জাদুকর তারপর আরও একটা রুমাল বের করে ওইরকম ভাবে সবাইকে দেখিয়ে নিল। সাধারণ একটা রুমাল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

তারপর তারা করল কী, পাঁচটা করে গিঁট দিয়ে, রুমালগুলোকে দুটো ন্যাকড়ার পুতুলের মতো বানিয়ে নিল। মুন্ডু হাত, পা, সব হল। সবাইকে ভালো করে দেখিয়েও নিল।

বড়ো জাদুকর এবার ন্যাকড়ার পুতুল দু-টোকে নিজের হাতের তেলোয় শুইয়ে বলল 'উট্ দেখি, খেল্ দেখা'! এই বলে যেই-না তাদের গায়ে ফুঁ দিল, অমনি পুতুল দুটো জ্যান্ত হয়ে তড়বড়িয়ে উঠে, ওর হাত থেকে এক লাফে মাটিতে নেমে পড়ল।

জাদুকর তখন তাদের নিয়ে কী খেল্‌টাই দেখাল, সে আর কী বলব। তারা নাচল, কুঁদল, কুস্তি করল, ডন্-বৈঠক করল, মার্চ করল, হ্যান্ড-শেক করল। জাদুকর যা বলে, বলবার সঙ্গে-সঙ্গে তাই করে। দেখে দেখে আমরা সবাই হাঁ!

শেষটা মেজো জাদুকর অসাবধানতা বশত ওদের দিল মাড়িয়ে। বড়ো জাদুকর হাঁ হাঁ করে ছুটে আসতেই, ভারি অপ্রস্তুত হয়ে মেজো পা উঠিয়ে নিল। কিন্তু পুতুল দুটির রাগ দেখে কে! ঘুষি বাগিয়ে তারা মেজো জাদুকরকে আক্রমণ করে সমানে কিল, চড়, লাথি, ঘুষি মেরে যেতে লাগল। কিছুতেই বড়ো জাদুকরের মানা শুনল না।

সেও তখন রেগে গিয়ে ওদের হাতে তুলে নিল। তা তারা হাতে থাকবে কেন, থপ থপ করে লাফিয়ে নেমে আবার তেড়ে যেতে চায়! আমাদেরই কী রকম ভয় ভয় করতে লাগল। শেষ অবধি বাধ্য হয়ে বড়ো জাদুকর ওদের ধরে, আবার যেই গায়ে ফুঁ দিল, অমনি তারা শুয়ে পড়ে আবার রুমালে গিঁট দেওয়া ন্যাকড়ার পুতুল হয়ে গেল। বড়ো জাদুকর গিঁট খুলে, রুমাল ঝেড়ে আবার আমাদের দেখিয়ে গেল।

খেল্‌ও ভেঙে যাচ্ছে, এমন সময় বড়ো জাদুকরের হঠাৎ মনে পড়াতে কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ে ছোটোটাকে বের করে আনল। সেও ঘণ্টাখানেকের বেশি মাটিতে পোঁতা থাকাতে দেখলাম খুব চটেছে। মুখ লাল করে কাপড় থেকে ধুলো মাটি ঝাড়াতে ঝাড়াতে, গজ্‌গজ্ করতে করতে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল!

আমাদের কারো মুখে আর কথা সরে না। ভাবলাম একেও যদি হাত-সাফাই বলে, তাহলে জাদু বিদ্যা আবার কী? তবে একটা কথা মাঝে মাঝে মনে হয়, এত জাদুই যদি জানে লোকগুলো তাহলে একটা বাঁকা টিনে করে সকলের কাছে দু-আনা করে পয়সা নিচ্ছিল কেন?

ডায়েরি

মিথ্যা কথা বলা যে এমন কিছু অন্যায় এ আমি বিশ্বাস করি না, এমনকী মাঝে মাঝে মিথ্যা কথা বলার দরকার হয়। আমি তো প্রায়ই মিথ্যা কথা বলি। আরও কত কী করি! বড়োদের পিছনে থেকে ভ্যাংচাই, কলা দেখাই, বক দেখাই। মাস্টারমশাইদের কথা শুনি না, মুখোমুখি জবাব দিই, পড়া ভালো করে তৈরি করি না। এরজন্য যদি কেউ আমার নিন্দা করে তো আমি থোড়াই কেয়ার করি।

ভালোছেলেদের তো আমি ভীতু মনে করি, খোসামুদে মনে করি। পাছে বকুনি খায় তাই তারা ভয়েই আধ-মরা, বড়োদের কোনোরকমে খুশি করতে পারলেই আহ্লাদে আটখানা! এঃ রাম, ছিঃ! আমাকে দেখ। দিব্যি আছি, খাই দাই, ঘুরে বেড়াই, যা খুশি তাই বলি, যা ইচ্ছে করি, কে আমার কী করতে পারে? বড়োদের কথা আমার ঢের ঢের জানা আছে। তারা নিজেরাই যথেষ্ট দোষ করে; আবার আমাদের বলতে আসে। ওসব চালাকি আমার কাছে চলবে না।

বেশ আছি, খাসা আছি, দিদিমার কাছে থাকি, দিদিমা আমাকে সোনামণি বলে ডাকেন, ভাবেন আমার মতো চাঁদের টুকরো আর হয় না; কেউ কিছু বললেও বিশ্বাস করেন না। এর থেকেই তো বড়োদের বুদ্ধির দৌড় বোঝা যাচ্ছে। যাই হোক বেশ ছিলাম, এমন সময় সেই বাঁদরের স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করলাম। চোখ বুজলেই বাঁদর। হাড়-জ্বালাতন হয়ে গেলাম। ঘুমোতে যেতে ইচ্ছে করত না। হয় বাঁদরটা ফল চুরি করে যাচ্ছে, নয় তো কাগজপত্র ছিঁড়ে একাকার করছে, নয় কাউকে আঁচড়াচ্ছে কামড়াচ্ছে খিমচোচ্ছে, নয় ভেংচি কাটছে, দাঁত খিচোচ্ছে। মোট কথা, এমন পাজি বাঁদর আমি জন্মে দেখিনি। অথচ রোজ রাত্রে চোখ বুজেছি কী বাঁদর এসে হাজির। কাউকে বলতেও বাধো-বাধো ঠেকতে লাগল। মা-বাবাকে চিঠি লিখে কি আর এসব বলা যায়? দিদিমা তো শুনলে অবাক হয়ে যাবেন হয়তো, ফলে আমাকে জোলাপ খেতে হবে।

তারপর বাঁদরটা ভীষণ বাড়াবাড়ি শুরু করে দিল। জাগা অবস্থাতেও এসে হাজির হত। ইস্কুল থেকে ফিরছি, বইগুলো শূন্যে খুলে যাচ্ছে। চীনাবাদাম কিনলাম, পান কিনলাম, পা দিয়ে খুব খানিকটা ধুলো উড়োলাম। ও পাড়ার গোবিন্দবাবু সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন, ভারি বিরক্ত হলেন। আমিও তাঁকে শিক্ষা দেবার জন্য কানের কাছে এইসা সিটি দিলাম যে ভদ্রলোকের পিলে চমকে উঠল।

হঠাৎ দেখি, আম বাগানের তলায় বাঁদরটা আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে, নিজের পিঠ চাপড়াচ্ছে, হাততালি দিচ্ছে, নিজের ল্যাজ ধরে নিজেই নাচছে কুঁদছে। ভাবখানা যেন ওর সঙ্গে আমার একটা

ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে! গোবিন্দবাবুও তাই দেখে হেসে বললেন, 'বা, বাঃ, তোর মাসতুতো ভাইও এসে হাজির হয়েছে যে।'

মনটা এত খারাপ হয়ে গেল যে তাকে কিছুই বললাম না, ভাবতে পার?

বাড়ি এসে দেখি আমার পিসিমা এসেছেন, তাঁর ননীর পুতুল মেয়ে ময়নাকে নিয়ে। মেয়েটি নরম, কচি, হাঁদার একশেষ। প্রথমটা একটু মাকড়সা-টাকড়সা দিয়ে ভয় দেখিয়েছিলাম, তা সে আবার দাদা দাদা করে আমাকেই জাপটে ধরল। কী আর করি, শেষটায় মাকড়সাটাকে তাড়িয়ে দিতে হল। মেরেই ফেলতাম কিন্তু ময়নাটা মাকড়সা মরে যাবে শুনে কেঁদেই সারা, অগত্যা জলের ছিটে দিয়ে তাড়ালাম। মাসিমাটি আমার আবার বেশ আছেন। ঘরে এসেই দেয়ালে জল ঢালার জন্য চেঁচামেচি লাগিয়েছেন! ময়না তখন বলল, 'না মা, দাদাকে ব'ক না, ও মাকড়সা তাড়িয়েছে।'

রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম বাঁদরটা একজন মোটা পাদ্রি সাহেবের সঙ্গে কুস্তি লড়ছে, পারছে না, আমাকে ডাকছে। আঁতকে জেগে গেলাম।

পরদিন ছুটি ছিল, ময়নাকে কয়েকটা আম-টাম পেড়ে দিয়েছিলাম, অবিশ্যি হেডমাস্টার মশাই-এর বাগান থেকে চুরি করে। রাত্রে চোখ বুজতে-না-বুজতে বাঁদর আর পাদ্রি দু-জনে এসে উপস্থিত। দেখলাম পাশাপাশি হাঁটছে, এ ওর দিকে আড় চোখে তাকাচ্ছে।

আমার শরীর খারাপ হয়ে যেতে লাগল, যখন-তখন বাঁদর দেখতে লাগলাম, যেখানে সেখানে পাদ্রি সাহেব মনে হতে লাগল। ইস্কুলে আমার দস্তুরমতো নাম খারাপ হয়ে গেল। এক সপ্তাহ কোনো ক্লাসে কোনো গোলমাল করলাম না, অবিশ্যি পড়াশুনোও করলাম না। বাঁদরটারও যেন কেমন মন খারাপ মনে হতে লাগল। একদিন বাড়ি ফেরবার পথে দেখলাম আমগাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসে আছে হাঁড়িপানা মুখটি করে। রাস্তার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে দেখলাম, একজন পাদ্রিসাহেব হাসি-হাসি মুখ করে যাচ্ছেন। কী যেন মনে হল, একটু ঢিল তুলে পাদ্রি সাহেবের দিকে ছুড়ে মারলাম। অমনি বাঁদরটা ফিক করে হেসে ফেলল।

সেদিন অনেকগুলো অন্যায় করে ফেললাম, সবগুলো অবিশ্যি ঠিক আমার দোষ নয়। পেয়ালা ভাঙলাম, মিছিমিছি বললাম ময়না ভেঙেছে, ময়নার টিকি টেনে, তাকে বক দেখিয়ে, কাঁদিয়ে-টাঁদিয়ে, কলা দেখিয়ে, বেরিয়ে গেলাম।

পাড়ার কতকগুলো ছেলের সঙ্গে রাস্তায় রাস্তায় হইচই করে বেড়ালাম; কত লোকের জানলার কাচ ভাঙলাম, কুকুর তাড়া করলাম, গোবিন্দবাবুর টিয়া পাখিটা ছেড়ে দিলাম, আরও কত কী যে করলাম তার ঠিক নেই। রাত্রে ফিরলাম দেরি করে, খেতে বসে গোলমাল করলাম— এ খাব না ও খাব না। দিদিমা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন; মাসিমা বললেন— 'দুটো কষে চড় লাগালে ছেলে সিধে হয়ে যাবে।' বললাম— 'তোমার ছেলেকে চড় লাগিয়ো, খবরদার আমার কাছে এসো না।' বলে উঠে দে দৌড়! সিঁড়িতে মনে হল সারি সারি বাঁদর দাঁড়িয়ে আছে। বাগানে বেরিয়ে গেলাম। গেটের পাশে আমার বন্ধু ন'টে দাঁড়িয়ে।

'কেন রে? কী হয়েছে?'

'বটু তুই টিয়া পাখি ছেড়ে দিলি, আর গোবিন্দবাবু হেডমাস্টারমশাই-এর কাছে নালিশ করেছেন যে, আমি ছেড়ে দিয়েছি। বাবা শুনলে তো আমার ছাল ছাড়িয়ে নেবেন।'

বললাম— 'চল, হেডমাস্টারমশাই-এর বাড়ি।'

পথে যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করলাম— 'ন'টে পেছন দিকে তাকিয়ে দেখত' কেউ ফলো করছে কিনা!'

ন'টে বললে— 'না তো।'

'একজন পাদ্রি সাহেব কী একটা বাঁদর নেই বলতে চাস?'

নটে বললে— 'কই না তো! তবে ওই গাছটাতে বাঁদর থাকতেও পারে। কেন রে?'

কিছু বললাম না, হেডমাস্টারমশাই-এর বাড়ি এসে গেলাম। তারপর তাঁকে বল রে, গোবিন্দবাবুকে ডাক রে, অপমানের একশেষ, জরিমানা ইত্যাদি— সে আর বলে কাজ নেই।

রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম পাদ্রি সাহেব আর বাঁদর কোলাকুলি করছে। ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম, বাঁদরটা কোলাকুলি করছে বটে, কিন্তু হাত বাড়িয়ে পাদ্রি সাহেব পিছনে চিমটি কাটতে চেষ্টা করছে।

মনটা খারাপ হয়ে গেল। তারপরই জ্বর-টর হয়ে মা-বাবার কাছে চলে গিয়েছিলাম, আর পাদ্রি সাহেবকে বা বাঁদরটাকে দেখিনি। মাঝে মাঝে খটকা লাগে।

ইচ্ছেগাই

মহালয়ার দিন বাড়ি এসেই বোকোমামা পকেট থেকে একটা কাচের তৈরি রাগী গোরুর মূর্তি বের করে বলল, ‘এটাকে একটা সাধারণ জিনিস মনে করিস না যেন, এর পেছনে একটা বিরাট ইতিহাস আছে।’ টিংটিঙে রোগা ছোট্ট একটা গোরু হাতের তেলোয় ধরে যায়, চার ঠ্যাং এক জায়গায় করে ভুরু কুঁচকে চোখ পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পেছনের পায়ে কালো রং দিয়ে ছোট্ট একটা ‘ন’ লেখা।

আমরা বললাম, ‘ওমা, এমন সুন্দর কাচের গোরু কোথায় পেলে বোকোমামা?’

বোকোমামা যেন আকাশ থেকে পড়ল। দু-চোখ কপালে তুলে বলল— ‘কাচ? হ্যাঁরে ইডিয়ট, তোরা কি স্ফটিকও চিনিস না? এটার গায়ে এক টুকরো রেশম জড়িয়ে আগুন লাগিয়ে দেখিস, রেশম পুড়বে না। কাচ না আরও কিছু!’

তাই শুনে নগা কোত্থেকে এক বাক্স দেশলাই বের করে, বোকোমামার রেশমি রুমাল ধরে টানাটানি করতে লাগল আর আমরা বাকিরা সবাই গোল হয়ে ওদের ঘিরে দাঁড়ালাম। বোকোমামা বিরক্ত হয়ে রুমালটি পকেটে পুরে, গোরুটিকে দরজার ওপরের তাকে তুলে রেখে বলল, ‘জ্যাঠামোই করবি, নাকি গল্পটি শুনবি, তাই বল?’

নগা বললে, ‘ওমা, গল্প নাকি? এই যে বললে বিরাট ইতিহাস?’

‘ওই, ওই একই হল, গল্প মানে সত্যি গল্প। তবে শোন্।’

নগা বললে, ‘আগে বলো, কোথায় পেলে ওটাকে?’

‘পাব আবার কোথায়? ওসব জিনিস কি আর কোথাও তৈরি হয় যে পাব? দেখেছিস কখনো ওরকম আরেকটা? উত্তরাধিকার সূত্রে ওটাকে পেয়েছি। আমার ঠাকুরদার বাড়ির চিলেকোঠায় পুরোনো জিনিসের সঙ্গে ছিল।’

আমি বললাম, ‘আর ইতিহাসটাকে জানলে কী করে? কাল তো মা বলছিলেন যে— আচ্ছা, আচ্ছা, এই থামলাম, তুমি বলো।’

বোকোমামা বলতে শুরু করল— ‘আমার ঠাকুরদার অবস্থা ভালো ছিল না। তিন ভাই একসঙ্গে থাকেন বলে চলে যেত; তার ওপর ঠাকুরমার যা মেজাজ, বাড়ির চালে কাক-চিল পর্যন্ত বসতে ভয় পায়। ঠাকুরদা বেচারি তাঁর ভয়ে জুজু। একদিন পাড়ার পাশার আড্ডায় বড্ড রাত করে ফেলেছেন, তার ওপর খাজনার টাকা জমা দেবার কথা ছিল, ভুলে তো গেছেনই, উপরন্তু টাকাগুলোকেও বাজিতে হেরেছেন।’

আমার মুখ দিয়ে ফস করে বেরিয়ে গেল— ‘কোত্থেকে জানলে এত কথা?’

বোকোমামা আমার দিকে ফিরে বললে— 'আমাদের বংশপরিচয়ে লেখা আছে। হল তো? তারপর শোন। হয়তো মাঝরাতও পেরিয়ে গেছে, একটু আগেই খুব বৃষ্টি পড়েছে, তারার আলোতে খুব সাবধানে গুটি গুটি এগুচ্ছেন, এমন সময় কানে এল— গাঁ—ক্! বাঘ মনে করে আরেকটু হলেই ঠাকুরদা পগারের মধ্যে পড়ে যাচ্চিলেন, এমন সময় চোখে পড়ল পগারের কিনারায়, এক-হাঁটু চটচটে কাদায় ডুবে একটা হাড়-জিরজিরে গোরু কাতর চোখে ওঁর দিকে তাকিয়ে আছে। ঠাকুরদার মনটা ছিল বড়োই দয়ালু, শরীরেও ছিল অসুরের মতো শক্তি, কাজকর্ম কিছু করতেন না তো, কাজেই সে শক্তির একটুও খরচ হয়নি। এবার নিমেষের মধ্যে মালকোঁচা মেরে, হাতের চেটোয় দু-পোঁচ থুথু মেখে নিয়ে, গোরুর পেছন দিকে এমনি এক ঠেলা মারলেন যে, চু—ক্ একটা শব্দ করে গোরুটা কাদা থেকে উঠে এসে রাস্তার মাঝখানে ছিটকে পড়ল। শীতে বেচারি ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে, চোখে জল চিক্‌চিক্ করছে।

'কী আর করবেন ঠাকুরদা, ওটাকে অমনভাবে ফেলে যেতে মন সরল না; তাই আঁজলা আঁজলা পগারের জল তুলে যথাসাধ্য গায়ের কাদা ধুয়ে ফেলে, নিজের এণ্ডির চাদরটা দিয়ে ভালো করে সর্বাঙ্গ মুছে দিলেন। এটা যে কত অসমসাহসিকতার কাজ, যারা আমার ঠাকুরদার ঠাকুমাকে চেনে না, তারা বুঝবে না।

'যাই হোক, তারপর দু-মুঠো দুব্বো ঘাস ছিঁড়ে গোরুটাকে খেতে দিয়ে ভয়ে ভয়ে ঠাকুরদা আবার বাড়িমুখো হলেন। ততক্ষণে মাথার ওপরকার তারাগুলো পশ্চিম দিকে বেশ খানিকটা ঢলে পড়েছে। আজ রাতে কপালে কী আছে কে জানে। অন্ধকার আমগাছের ছায়া দিয়ে আরও গজ পঞ্চাশেক এগিয়েছেন এমন সময় পেছনে শোনেন খপ্ খপ্ খপ্ খপ্! আঁতকে উঠে ফিরে দেখেন— গোরুটা করুণমুখে কাদা ভেঙে ভেঙে সঙ্গে চলেছে। ঠেলা দিলেন, তাড়া দিলেন, এমন কী একটা কাঠি দিয়ে সপাসপ্ দু-ঘা লাগিয়েও দিলেন, কিন্তু গোরু গেল না। খালি দু-চোখ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল।

'শেষটা ঠাকুরদা তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন— 'নেহাতই যাবি না যখন চল্ তাহলে, ছেলেপুলেগুলো একটু দুধ খেয়ে বাঁচুক। গোরু এনেছি দেখে গিন্নির রাগও খানিকটা পড়তে পারে। আ, আ, আ, তু, তু, তু,।'

'বাড়ি পৌঁছে, সামনের দিক দিয়ে না ঢুকে ঠাকুরদা বাড়ির পেছনে রান্নার চালাঘরের দিকে গেলেন। সামনের ঘর দুটোতে তাঁর দাদা, মেজদা শুয়ে থাকেন, তাঁদের না চটানোই ভালো মনে হল। চালা ঘরের দরজার হুড়কোটাকে এক-একটা লম্বা মানুষ ওপরের ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে খুলে ফেলতে পারে, এটা ঠাকুরদা জানতেন। আজ রাতের মতো সেখানেই না হয় আশ্রয় নেওয়া যাবে। বুক টিপ্ টিপ্ করছে, ভাবছেন— আহা যদি একগোছা টাকা আর একজোড়া একশো ভরির রুপোর তাগা গিন্নির পায়ের কাছে ফেলে দিতে পারতাম, তা হলে গিন্নি আমাকে কত আদর করত! ওরে গোরু এটা যদি করে দিতে পারতিস, তাহলে আমার কোনো ভাবনাই ছিল না। নইলে আজ এই খালি পেটে মাটিতে শোয়াই আমার কপালে আছে। এই অবধি বলেই তো ঠাকুরদার চক্ষু স্থির! ভাঁড়ার ঘরের দেওয়ালে ইয়া বড়ো সিঁদকাটা তার মানে চোর ঢুকে কাঁঠাল কাঠের সিন্দুক থেকে তিন পুরুষের জমানো ভারী ভারী খাগড়াই কাঁসার বাসনগুলো পাচার করেছে। হায়! হায়! দামি জিনিসের মধ্যে ছিল তো শুধু ওই! এবার তাও গেল।

'এমন সময় গোরুটার ঘোঁত ঘোঁত শব্দ শুনে ফিরে দেখেন উঠোনের কোনায় ভাতের ফেন ঝাড়বার গামলার আড়ালে মিটমিট করে একটা তেলের পিদিম জ্বলছে, তার সামনে মাটির ওপর পড়ে আছে এক তোড়া টাকা আর এক জোড়া ভারী রুপোর তাগা। চোররাই যে অন্য কোথাও

থেকে এগুলো সরিয়ে এনে এখানে রেখে কাঁঠাল কাঠের সিন্দুক নিয়ে ব্যস্ত আছে, সে বিষয়ে ঠাকুরদার মনে কোনো সন্দেহই রইল না।

'নিমেষের মধ্যে সেগুলোকে কুড়িয়ে নিয়ে, চালাঘরের সামনে দাঁড়িয়েই এমন বিকট চিৎকার জুড়ে দিলেন যে, প্রথমটা নিজের কানে যেতে নিজেরই পিলে চমকে উঠেছিল। তারপরেই বুঝলেন প্রভুভক্ত গোরুটাও সঙ্গে সঙ্গে চ্যাচাচ্ছে বলে ওরকম বীভৎস শোনাচ্ছে। আর যাবে কোথা, দেখতে দেখতে দা কুড়ুল নিয়ে বড়দা মেজদা তো বেরিয়ে এলেনই, লাঠি সোঁটা কাস্তে হাতে পাড়ার লোকরাও এসে জুটল। তারি ফাঁকে তেলমাখা রোগা রোগা তিনটে লোক পাঁই পাঁই ছুট লাগাল। দু-একজন ধরতে চেষ্টা করল বটে কিন্তু চোরদের তেল চুকচুকে গা হাতের মধ্যে সুড়ুত করে পিছলিয়ে বেরিয়ে গেল।

মোট কথা, চোর ধরা গেল না বটে কিন্তু শুধু যে নিজেদের বাসনের গোছা বেঁচে গেল তা নয়, সেইসঙ্গে রাশি রাশি চোরদের জিনিসও পাওয়া গেল, রুপোর পিলসুজ, পঞ্চপ্রদীপ এইসব। কে জানে কোত্থেকে এনেছে। দাদা মেজদারা অবিশ্যি তখুনি বলতে লাগলেন, 'ইস্, দেখেছ, বাবার পুজোর জিনিসগুলোও নিচ্ছিল, এত বড়ো আস্পর্ধা!' এই বলে তাড়াতাড়ি সব-কিছু সিন্দুকে তুলে ফেললেন, কিন্তু পাড়ার লোকের আর জানতে বাকি ছিল না যে, গত পঁচিশ বছর ধরে সিন্দুকের মধ্যে একটা ভাঙা লক্ষ্মীর ঝাঁপি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ঝাঁপিটাতে খালি একটা সিন্দুর মাখানো ফুটো পয়সা ছাড়া আর কিচ্ছু ছিল না। কিন্তু টাকার তোড়া আর তাগা কারো চোখে পড়েনি। ভাসুরদের সামনে একগলা ঘোমটা দিয়ে ঠাকুমা দাঁড়িয়ে ছিলেন। কোনো সুযোগে তাঁর হাতে টাকা আর গয়না গুঁজে দিতেই নিঃশব্দে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। পরে সবাই চলে গেলে গোরুটাকে রান্নাঘরে বন্ধ করে রেখে, ঘরে গিয়ে ঠাকুরদা দেখেন— আসন পেতে, ভাত বেড়ে, পাখা হাতে ঠাকুমা বসে আছেন। ঠাকুরদা ভাবলেন, এতদিন বাদে বোধ হয় তাঁর কপাল ফিরেছে।

'পরদিন চোখে মুখে রোদ পড়াতে যখন ঘুম ভাঙল তখন কিন্তু ঠাকুমার অন্য চেহারা।— কোত্থেকে এই মড়াখেকো গোরুটাকে জোটালে বলো দিকিনি? হতচ্ছাড়ি রাতারাতি রান্নাঘরের খড়ের চালের আধখানা খেয়ে শেষ করেছে! ওইরকম একটা হাড় জিরজিরে জানোয়ার পোষে কেউ? ওর মালিক ওকে নিশ্চয় খেদিয়ে দিয়েছে পাছে বাড়িতে মরে, একটা অকল্যাণ ডেকে আনে। আর তুমি কিনা খাজনার টাকা দিয়ে তাই কিনে নিয়ে এলে ঘরে! পেছনের পায়ে আবার দেখছি একটা 'ন' লেখা রয়েছে, এবার দারোগা এসে হাতে হাতকড়া দিয়ে নিয়ে যাক আর কী!

'ঠাকুরদা অবিশ্যি শেষ কথাগুলো আর শোনেননি, তড়াক করে লাফিয়ে উঠে সোজা রান্নাঘরে! কাল থেকেই কেমন সন্দেহ হচ্ছিল, তার ওপর পায়ে 'ন' লেখা শুনে একেবারে আঁতকে উঠলেন! মুখ না ধুয়ে, জলখাবার না খেয়েই গোরু নিয়ে নদীর ধারের আম বনে চলে গেলেন। সেখানে নির্জনে গোরুটাকে আদর করে বললেন, 'নন্দিনী, মা রে, আমাকে একটা বড়ো দেখে ডিম ভরা ইলিশ মাছ পাইয়ে দে দিকিনি।' অমনি বলা নেই কওয়া নেই, মাঝ নদী থেকে দামু ডাক দিল— 'ও ছোটোবাবু, ইলিশ মাছ নেবেন? আজ বড়োজোর জাল ফেলেছি, তাই এটাকে বামুনকে দেব বলে মনে ভেবেছি।' পাড়ে নেমে মাছটি দিয়ে দামু বললে— 'কী ছিরির গোরু গো, কিনলেন নাকি ট্যাকের পয়সা খরচ করে?' ঠাকুরদা হেসে বললেন, 'দূর পাগল, এ গোরু কি কেনে নাকি কেউ!' দামু বললে, 'তা দানের জিনিসের দোষ ধরতে নেই। বেশ গোরু।'

'দামু চলে গেলে গোরুটার চারটে খুরে গড় করে, নিজের হাতে কচি কচি দুব্বোঘাস তুলে এনে খাওয়াতে লাগলেন ঠাকুরদা। তবে নিরবচ্ছিন্ন সুখ বলে কিছু হয় না দুনিয়াতে। হিংসুটে পাড়ার লোকগুলো পিলসুজ পঞ্চপ্রদীপের কথা গিয়ে থানার দারোগার কাছে লাগাল, এমনকী পাশের

গাঁয়ের জমিদারবাবুর গোমস্তা দারোগাকে সঙ্গে করে এনে তাঁদের কুলপুরোহিতকে দিয়ে পিলসুজ পঞ্চপ্রদীপ চিনিয়ে নিয়ে চলে গেল। ব্যাপারটা আরও অনেক দূরে গড়াত নিশ্চয়ই যদি না অতগুলো সাক্ষী থাকত। তা ছাড়া তাগা পেয়ে চুপ করে থাকা দূরে থাকুক, গিন্নী অষ্টপ্রহর বায়না ধরলেন ওইরকম ডিজাইনের হাঁসুলিও চাই! ইলিশ মাছটা খেয়ে বাড়িসুদ্ধ সকলের পেটের অসুখ করল।

'তবু গিন্নীর তাগাদায় অতিষ্ঠ হয়ে ঠাকুরদা পরদিন আমবনে গিয়ে হাঁসুলি চেয়ে বসলেন। তোলা হাঁড়ির মতো মুখ করে গোরুটা একবার তাকাল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মাথার ওপর কাগের বাসায় খচ্‌মচ্‌ ঝটপট। ওপরে তাকিয়ে দেখেন, বাসার ধার দিয়ে হাঁসুলি একটুখানি ঝুলে রয়েছে। অগত্যা গাছে চড়ে সেটি উদ্ধার করতে হল। নামতে গিয়ে ডালসুদ্ধ ভেঙে পড়ে ডান হাতের কব্জিটা গেল মটকে, সর্বাঙ্গে ব্যথা। ট্যাঁকের মধ্যে হাঁসুলি আর বাঁ হাতে গোরুর দড়ি নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাড়ি আসবার সময় ঠাকুরদা ভাবলেন, সাধে কি নন্দিনীটাকে স্বর্গ থেকে তাড়িয়েছে! ইচ্ছে পূর্ণ করে বটে, মা, কিন্তু সঙ্গে একটা করে লেজুড় জোড়ে কেন? সে যে বড়ো বালাই!

তবু মানতে হচ্ছে, গোরু পেয়ে কপাল ওদের ফিরে গেছিল। আসল ব্যাপার কাউকে না বলে, ঠাকুরদা ঠাকুমাকে শুধু বলেছিলেন।

'গোরুটার বড়ো পয়, নিজেই ওটার যত্ন করব।' ঠাকুরদা গোরুর নাওয়া খাওয়া দেখতে লাগলেন, কিন্তু যে হাড়-জিরজিরে সেই হাড়-জিরজিরে অথচ বকরাক্ষসের মতো খিদে। যা দেওয়া যায় চিবিয়ে গিলে বসে থাকে। বালিশ বিছানা শীতের কাপড়, কোনো বাছবিচার নেই। ঠাকুরদা অবিশ্যি আবার সবই নতুন চেয়ে নেয়, কিন্তু সঙ্গে থাকে একটা করে ল্যাজ। নতুন বিছানা এল শিষ্যবাড়ি থেকে, কিন্তু বালিশে একটা কাঁটা ছিল, সেটা বড়দার মাথায় ফুটে যায়-যায় অবস্থা। নতুন র‍্যাপার পাওয়া গেল লটারি জিতে, কিন্তু হিংসা করে ফটিকবাবু দু-বাড়ির মাঝখানে বেড়ার দরমাটা বন্ধ করে দিলেন। এখন হাটে যেতে সদর ঘুরে যেতে হয়। ফটিকবাবুর সঙ্গে মুখ দেখাদেখি বন্ধ!

'তারপর বড়োমেয়ের ভালো বিয়ে ঠিক করে দিল গোরুটা। আজকাল আর পয়সাকড়ির ভাবনা নেই, ধুমধাম করে বিয়ে হয়ে গেল, গাঁসুদ্ধ সবাই ধন্য-ধন্য করল, খাসা বর, ভালো ঘর। খোসমেজাজে ঠাকুরদা তাঁর নিজের বিয়েতে যৌতুক পাওয়া সোনারপুরের খামারটি জামাইকে দান করে দিলেন। এই খামার কিনবার জন্যে ওই ফটিকবাবুই কী কম ধরাধরি করেছে। তার মুখের ওপর বলে দিয়েছিলেন ঠাকুরদা যে, বিলিয়ে দেবেন তবু ওকে দেবেন না। বিয়ের পরদিন জানতে পারলেন— বরটি আর কেউ নয়, ওই ফটিকেরই ভাগ্নে এবং ফটিকই তার গার্জেন! অর্থাৎ তাকে দেওয়া মানেই ফটিককে দেওয়া।

'একটা ছেলে ছিল ঠাকুরদার, তার বউটি বড়ো লক্ষ্মী, কিন্তু ছেলেটা একটা লক্ষ্মীছাড়া, কাজকর্ম করে না, সারাদিন আড্ডা। গোরুর পায়ে ফুলচন্দন দিয়ে ঠাকুরদা ছেলের মতিগতি ফিরিয়ে একটা চাকরি পাইয়ে দিলেন। অমনি ছেলে গেল শুধরে, কিন্তু বউয়ের রোয়াবের চোটে বাড়িতে কেউ টিকতে পারে না। গিন্নি পর্যন্ত তার সঙ্গে পেরে ওঠেন না।'

'অগত্যা গোরুকে বলে ছেলেকে তমলুকে বদলি করালেন ঠাকুরদা। অমনি নিজে পড়লেন ম্যালেরিয়ায়, জমিজমা কে দেখে তার ঠিক নেই; বলা বাহুল্য, এর আগেই গোরুর সাহায্যে ভাইদের কাছ থেকে আলাদা হয়েছেন এদিকে পয়সাকড়ি যত বাড়ে সঙ্গে সঙ্গে ঝামেলাও বাড়ে পাঁচগুণো! তিনতলা বাড়ি হল বটে, কিন্তু চোরের ভয়ে তার সব জানলায় শিক দেওয়া, বড়ো ফটকে পাহাড়াওয়ালা, বাগানে চৌকিদার, বাড়ি থেকে একটু বেরোবার জো নেই। তাছাড়া বড়োলোকদের সঙ্গে এখন মেলামেশা, অথচ জামা গায়ে দিলেই ঠাকুরদার গা কুটকুট করে। এবং সবচেয়ে বড়ো কথা হল, পাড়ার পাশার আড্ডাটি ছাড়তে হয়েছে। এমনকী সে পাড়া থেকেই উঠে নতুন রেল

স্টেশনের কাছে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ির পাশে জমি কিনে বাড়ি করতে হয়েছে! পয়মন্ত গোরুটির জন্যে পাকা গোয়াল হয়েছে, কিন্তু তার হাড়-জিরজিরে চেহারাটি বদলায়নি, উপরন্তু বন-বাদাড় পুকুর পগারের অভাবে আর সম্ভবত নিত্যি ফরমায়েস শুনে শুনে মেজাজটি হয়ে উঠেছে খিটখিটে। বুদ্ধি করে তার সেবাযত্নের ভার ঠাকুরদা বরাবর নিজের হাতেই রেখেছেন; তাঁর কান কামড়ে, পা মাড়িয়ে, গুঁতো মেরে, তাঁর ওপর রোজ সে রাগ ঝাড়ে। আজকাল তার কাছে কিছু চাইতেই ভয় করে। চাইলেই পাওয়া যায় কিন্তু ফ্যাকড়া সুদ্ধু নিতে হয়। এমনকী মাঝে ঠাকুরদার মনে হয়, গোরুটাকে তার আদি বাসস্থান অর্থাৎ স্বর্গে পাঠাবার কোনো ব্যবস্থা করা যায় না? মানে জ্যান্ত অবস্থায়। তাই বলে তো আর— যাকগে সে কথা।

'এত দুঃখের ওপর ফটিকবাবুকে বেয়াই বলে ডাকতে হচ্ছে, তাঁকে চা জলখাবার দিতে হচ্ছে, গিন্নির কাছে তাঁর বেজায় খাতির, এ বাড়ির সব ব্যবস্থা একরকম তাঁর কথামতোই হয়।

'একদিন সন্ধ্যেবেলায় পাশার আড্ডার বন্ধুদের জন্যে আর সেখানকার ধামাভরা গরম মুড়ির সঙ্গে তেলেভাজার জন্যে প্রাণটা যখন আঁক্‌পাঁক্ করছে, ঠিক সেই সময় হতভাগ্য ফটিক এসে বললে, 'সুখবর আছে, বেয়াই। এককালে নিজেই কত পঞ্চায়েতের তাড়া খেয়েছ, কিন্তু এখন তোমার মতো একজন গণ্যমান্য লোক গ্রামের পঞ্চায়েতে না বসলে কি ভালো দেখায়? তাই সেই ব্যবস্থাই করে এলাম। কী বলেন, বেয়ান?'

'অমনি ঠাকুরমাও এক গাল হেসে বললেন, 'বা, বেশ হয়েছে, সারাটা সন্ধ্যেই বাবু সেখানে আটঁকা থাকবেন তো? এই সুযোগে ওঁকে দিয়ে গ্রামের তাসপাশার আড্ডাগুলোও তুলিয়ে দিতে হবে।'

'এই অবধি শুনে ঠাকুরদা সটাং গোয়ালঘরে গিয়ে নন্দিনীর কান মলে, ল্যাজ মুচড়ে বললেন, আর তো সহ্য হয় না মা! এক্ষুনি তুই ফটিকের হ।' তাই শুনে রেগেমেগে যেই-না গোরুটা অ্যাটাক করবার জন্যে চার পা এক জায়গায় জড়ো করেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে ভু—স্ করে নন্দিনী ডিস্যাপিয়ার্ড। তার বদলে ঠাকুরদা দেখেন, হাতের মুঠোর মধ্যে অবিকল সেই গোরু, মায় পেছনে 'ন' লেখাটাসুদ্ধু। এই নে, বিশ্বাস না হয়, দেখতে পারিস!'

গল্প শেষ করে বোকামামা রেশমি রুমালটা দিয়ে মুখ হাত ঝাড়তে লাগল। গোরু হাতে নিয়ে নগা বললে, 'তা গোরুর অত রাগ কীসের শুনি?'

বোকোমামা হাসল, 'কী আশ্চর্য, রাগ হবে না? ঠাকুরদা চাইলেন গোরুটা ফটিকবাবুর হোক— হয়ে তাঁকেও খুব জ্বালাক। আর নন্দিনী বুঝল— তাকে স্ফটিকের তৈরি হতে হবে, কচি দুব্বো খাওয়া ঘুচবে! রাগ হবে না, বলিস কী?'

ঠিক সেই সময় ছোটোমাসি ছুটে এসে নগার হাত থেকে গোরু ছিনিয়ে গালে ঠাস-ঠাস করে গোটা দুই চড় কষিয়ে বললে, 'ফের আমার জিনিসে হাত দিয়েছিস কী দেখবি মজা! কতকালের গোরু, ঠাকুমা নিজের হাতে আমাকে দিয়েছিলেন, কলেজ স্ট্রিট থেকে কত কষ্ট করে আমার নাম নন্দিনীর ন লেখালুম, আর সেই গোরুকে কিনা হতচ্ছাড়া এক্ষুনি হাত থেকে ফেলে নয়-ছয় করে দেবে!'

নন্দিনীর ন শুনে আমরা সবাই থ। ওদিকে চড় খেয়ে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে নগা বললে— 'চাই না তোমার পচা গোরু! যাক ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে, আমি খুব খুশি হই!'

এই-না বলে ছোটোমাসির হাতের গোরুকে যেই-না সামান্য একটু ঠেলে দিয়েছে, অমনি হাত ফসকে শানের মেঝেতে গোরু পড়ে খান-খান! আর নগার পিঠেও বেদম জোরে গুমগুম!

কাষ্ঠ হেসে বোকোমামা বললে, 'হল তো? বলিনি পেছনে ফ্যাকড়া থাকে।'

পরিদের দেশে

দাদু ডেকে বললেন, 'ওরে টুনু মিনু নেপো ধেপো ইলু বিলু শোন্। পরিদের দেশে গেছিস্ কখনো?'

শুনে তারা তো হেসেই খুন! পরিদের দেশ আবার হয় নাকি? ও তো ঠাকুমাদের বানানো গল্প!

দাদু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তবে কি আমার ঠাকুরদার বাড়ির চিলেকোঠার মস্ত সিন্দুকটাও ঠাকুমাদের বানানো গল্প বলতে চাস্? যাঃ! তোদের আর কোনো গল্পই বলব না!'

ওরা অমনি তাঁকে ঘিরে ধরল।

'না, দাদু, না! বলতেই হবে তোমার ঠাকুরদার বাড়ির সেই চিলেকোঠার সিন্দুকের কথা!'

দাদু তো তাই চান। বললেন, 'শোন্ তবে।'

'ঠাকুরদার বাড়ির ছাদের ওপর চিলেকোঠার ঘরে ছিল কবেকার কার তৈরি করানো সিন্দুক— কে জানে! এক-মানুষ উঁচু, আলমারির মতো দাঁড় করানো, কাঁঠালকাঠের তৈরি এক সিন্দুক। তার দরজার ওপর লাল রং দিয়ে লক্ষ্মীঠাকরুণের প্যাঁচা আঁকা, তার নীচে সোনালি রং দিয়ে ছোটো দরজা আঁকা, তার মাঝখানে আবার ছোট্ট একটা চাবির ছ্যাঁদাও আঁকা ছিল।'

'যখন ছোটো ছিলাম, রোজ অবাক হয়ে দেখতাম আর ভাবতাম, আঁকা চাবির ছ্যাঁদার চারদিকে চাবি ঘুরানোর দাগ কেন?'

'সত্যিকার চাবির ছ্যাঁদায় চাবি ঢুকিয়েও ও সিন্দুক কেউ খোলে না, তবে আবার আঁকা ছ্যাঁদায় চাবির দাগ পড়ে কী করে?'

'ঠাকুমা বলতেন, ষাট ষাট, চুপ চুপ, ও কথা মুখেও আনিস নে! তোর ঠাকুরদার ঠাকুরদার বাবার মানত করা সিন্দুক, ওতে চাবি লাগাতে নেই! মাথা ঠেকিয়ে নমঃ কর এক্ষুনি!'

'আমিও তাই করতাম, আর আড়চোখে চেয়ে দেখতাম, আঁকা ছ্যাঁদার চারদিকে চাবির দাগ!'

সন্ধ্যেবেলায় পণ্ডিতমশাই সংস্কৃত পড়াতে আসতেন। তেলের লম্পের আলোতে অং-বং পড়া, সে যে কী কষ্ট তা আর তোরা কী বুঝবি! আবার শব্দরূপ মুখস্থ না হলে— বাপ্‌রে, সে কী কান প্যাঁচানোর ধুম!'

'একদিন পড়া তৈরি করতে ভুলে গেছি। সন্ধ্যেবেলায় যেই-না দূর থেকে সদরের উঠোনে পণ্ডিতমশাইয়ের খড়মের শব্দ শুনেছি অমনি এক দৌড়ে সিঁড়ি ডিঙিয়ে একেবারে চিলেকোঠায়!'

'ঢুকেই দরজাটাকে ভেতর থেকে খিল তুলে দিয়ে, ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে, হাঁপাতে লেগেছি। চারদিক থমথম করছে, চুপচাপ, শুধু নিজের বুকের ধুক্‌পুক্ শুনতে পাচ্ছি, আর দূরে কোথায় একটা খোঁজ-খোঁজ ধর-ধর শব্দ!'

'যদি এখানে এসে দরজায় ধাক্কাধাক্কি করে? তবেই তো পুরোনো দরজার খিল খসে পড়বে! ইদিক-উদিক চাইতেই হঠাৎ দেখি— কালো সিন্দুকের আঁকা দরজায় ছোট্ট একটা সোনালি চাবি ঝুলছে!'

'আমি তো অবাক! আঁকা দরজার ছ্যাঁদায় কে আবার চাবি এঁকে দিল! এ ঘরে তো আমি ছাড়া বড়ো একটা কেউ আসেই না! আস্তে আস্তে কাছে গিয়ে হাত দিতেই চমকে উঠলাম। আঁকা তো নয়, সত্যিকার চাবি— ঘোরাতেই অমনি খুট্ করে খুলে গেল। আমি তো প্রায় মুচ্ছো যাই আর কি!'

'তারি মধ্যে কানে এল ঘরের বাইরে সিঁড়ি দিয়ে ধুপধাপ করে কারা ওপরে উঠে আসছে। আর কথাটি না বলে চাবি ধরে টেনে আঁকা দরজাটি খুলে ফেলে, ভেতরে সেঁদিয়ে গেলাম।'

'কী রে টুনু মিনু নেলো ধেলো ইলু বিলু, হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছিস্ যে বড়ো? বলছি না, আঁকা দরজাটা টেনে খুলে ফেলে, ভেতরে ঢুকে, দরজাটা আবার বন্ধ করে, ওই সোনালি চাবিটা দিয়েই ভেতর থেকে এঁটে দিলাম।'

'সেখানে ফুটফুট করছে আলো। সেই আলোতে চেয়ে দেখি হাতের চাবিটা কেমন যেন চেনা চেনা। মাথার ওপর ছোট্ট একটা হাতি বসানো, শুঁড়টা একটু ঝাঁকা, এই তো আমার মার মিনে করা গয়নার বাক্সর সেই হারানো চাবিটা। সেই যেটাকে কোথায় রেখেছিলাম ভুলে গেছলাম, এই তো দিব্যি এখানে আঁকা দরজায় লাগানো ছিল! অথচ মা পয়সা খরচ করে নতুন চাবি করিয়ে রেখেছেন।'

'অমনি চারদিক থেকে দলে দলে সব ছেলেমেয়েরা এসে হাজির। কোন কালে কার সঙ্গে খেলা করেছি, কার সঙ্গে পড়েছি, তাদের নাম পর্যন্ত ভুলে গেছি। তারাই এখন আমাকে দেখে ছুটতে ছুটতে এল। খুশিতে কেমন সবাই ডগমগ!'

'হাতে করে নিয়ে এল কত ছাতা, টর্চ, পেন্সিল, বই, পেন্সিল-কাটা-কল, একটা ইস্কুলের ব্যাগ অবধি! সব আমার হাতে গুঁজে দিতে চায়! আমি তো লজ্জায় মরি। এত জিনিস কারো কাছ থেকে নেওয়া যায় কখনো! ওরা বলে কি না— না না এ-সব তোমারি জিনিস, এখানে-ওখানে ভুলে ফেলে এসেছ, দেখো, চিনতে পার কি না, এই দেখো তোমার নাম লেখা!'

'তখন চারদিকে চেয়ে দেখি জায়গাটাও তো আমার চেনা জায়গা। এই তো এখানে ন্যাসপাতি গাছের তলায় ছোটোবেলায় কত খেলা করেছি। এই তো গাছের ছোট্ট কোটর থেকে সেই আমাদের চেনা কাঠবেড়াল মুখ বাড়াচ্ছে! সব ভুলে গেছলাম।

এ কোথায় এলাম, এ যে সবই চেনা, এ সবই যে আমার ছিল! কানের কাছে কে বললে— 'চেরতা খেতে ভুলে গেলে চলবে কেন, এই নাও ধরো।'

'চেয়ে দেখি সেই আমার ধাই মা! আরে, ধাইমার মুখটাও যে ভুলে গেছলাম। ধাইমার পায়ে পায়ে আমার ছোটোবেলাকার উনুনমুখো সাদা বেড়াল ছানাও এসে উপস্থিত। ধাইমা তাকে সরিয়ে দিয়ে বললে, 'ওসব এখন নয়, এখন বসো, পড়া করতে ভুলে গেছ না? এই নাও ধরো বই, সমস্কৃত শব্দ মুখস্থ করতে হবে না? ভুলে যেয়ো না, এটা পরিদের দেশ? এই নাকি সেই পরিদের দেশ, যেখানে যত রাজ্যের ভুলে-যাওয়া জিনিস সব পাওয়া যায়?

'আহা ওই তো আমার হারানো মার্বেলের ঢিবি, ন্যাসপাতি গাছের নীচে ছোটো একটি পাহাড় হয়ে আছে! ওই তো আমার খেলার বন্দুকটি, ওই যে আমার বনাত-মোড়া জলের বোতল; ও দুটিকে ক-বছর আগে চড়িভাতি করতে গিয়ে কাদের বাগান-বাড়িতে যেন ফেলে এসেছিলাম, তার ঠিকানাও ভুলে গেছি!'

‘এই তবে পরিদের দেশ? আহা, কী ভালো, কী ভালো! আর যে এ-সব দেখতে পাব তা ভাবিনি! ওই তো আমার বুড়ি দিদিমারা তিনজনই এখানে! যখন পড়তে শিখিনি, কত পরির গল্পই-না বলেছেন আমাকে! আহা, অমন মানুষদের ভুলে গেছলাম! এরা যে ডানাওয়ালা পরিদের চেয়েও অনেক ভালো, অনেক ভালো। দু-হাত বাড়িয়ে সবাইকে একসঙ্গে বুকে জড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করতে লাগলাম।’

দাদু এই অবধি বলে উঠে পড়লেন।— ‘আহা, অমন দেশ ছেড়েও লোকে ফিরে আসে! ওরে টুনু মিনু নেপো ধেপো ইলু বিলু— তোরা তো নিত্যি সব ভুলে যাস; চল্ চল্, আমার সাথে পরির দেশে চল্! দেখবি, সেখানে তোদের জন্যে আলাদিনের ভাঁড়ার ঘর অপেক্ষা করে রয়েছে!’

‘আর দ্যাখ্, সঙ্গে কিছু টিপিন্ নিয়ে নিস্। ওখানে বড়ো খিদে পায়। খাবারের তো কোনোই ব্যবস্থা দেখলাম না সেখানে। থাকবে কোত্থেকে? খেতে যে কেউ ভোলে না ভুলে-যাওয়ার দেশে, খাবার কোথা পাবে গো! তাই তো সেবার তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম। চল্ চল্— টিপিন নিয়ে চল্ রে—।’

হানাবাড়ি

হানাবাড়ির দোতলার মাকড়সার জালে ঘেরা জানলার ভাঙা পাল্লার ফাঁক দিয়ে পরেশবাবু অনিমেষের আগমন লক্ষ্য করলেন। উত্তর রাধাপুর ইউনিয়ন ক্লাবের আরও তিনজন সভ্য, অর্থাৎ স্বয়ং দারোগাবাবু, বড়োবাবুর বড়ো শালা বটুকবাবু আর হেডমাস্টার ওর সঙ্গে এসেছিলেন। এইরকমই কথা হয়েছিল; বাইরের তিনজন গণ্য-মান্য ব্যক্তি সাক্ষী থাকবেন। তাঁরাই অনিমেষকে পৌঁছে দেবেন, সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়ার পর রাত আটটায়। আবার ভোর পাঁচটায় তাঁরাই এসে তাকে নিয়ে যাবেন। তবে ভূতের বাড়ির ভিতরে কেউ পা দেবেন না সকালের আগে।

উত্তর রাধাপুর ইউনিয়ন ক্লাবের চৌকিদার নকুল— তাকে চৌকিদারও বলা যায়, ফরাসও বলা যায়, ক্লাবের গোড়া পত্তন থেকে আছে বলে আজকাল তার বড়োই বাড় বেড়ে গেছে, বর্মা থেকে এসে অবধি পরেশবাবু এটা লক্ষ করেছেন। কিন্তু আর পাঁচজন গণ্য-মান্য সভ্যরা যখন কিছু বলেন তো না-ই, বরং তার বে-আদবি দেখে বেশ মজাই পান, তখন নবাগত পরেশবাবুর কিছু বলা শোভা পায় না, এই ভেবে তিনিও কিছু বলেন না। অনিমেষ হল গিয়ে ওই নকুলের ঘোড়া।

অবিশ্যি অনিমেষ কিছু সত্যিকার ঘোড়া নয়, বরং অনেকেরই মতে সে একজন সুস্থ স্বাস্থ্যবান সুশিক্ষিত সুদর্শন ল' পরীক্ষা পাস করা যুবক, সবে মুন্সেফ্ হয়েছে, এবং সব চেয়ে বড়ো কথা সে হল গিয়ে নকুলের স্বর্গগত পুরোনো মুনিবের একমাত্র ছেলে। নকুলের চোখে সে একটি ভগবান বিশেষ, তার কোনো দোষ সে দেখতে পায় না। সে যাক্ গে, এ বিষয়ে বেশি বলতে গেলে লোকে ভাবতে পারে পরেশবাবু অনিমেষকে হিংসে করেন। মোট কথা অনিমেষকে নিয়েই যখন বাজি আর নকুল যখন তার সব চেয়ে বড়ো সাপোর্টার, তখন তাকে নকুলের ঘোড়া বললে দোষ হয় না।

তাছাড়া, পরেশবাবুর পঞ্চান্ন বছর বয়স, ব্যাবসা করে বর্মায় বেশ নামডাক পয়সাকড়ি করেছিলেন, এখন ভাগ্যের দোষে সে সবই প্রায় খুইয়েছেন, কিন্তু তাই বলে অনিমেষের মতো একটা চ্যাংড়া ছোকরাকে তিনি হিংসে করতে যাবেন কোন দুঃখে? আসল কথা হল ওই নকুলটির আর অনিমেষের দু-জনেরই একটু শিক্ষা দরকার হয়ে পড়েছে। ক্লাবের আর সকলেই যখন অনিমেষের রূপ-গুণ দেখে অজ্ঞান আর নকুলের ভাঁড়ামিতে আহ্লাদে আটখানা, তখন পরেশবাবুকেই সেই শিক্ষাটুকু দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। হাজার হোক, অনিমেষের বাবা অজানেশ তো একদিক দিয়ে দেখতে গেলে পরেশবাবুরই বন্ধু ছিলেন। তাঁরা একসঙ্গে বর্মা গেলেন, ব্যাবসা শুরু করলেন, পরেশবাবু ফেঁপে উঠলেন। আর অজানেশ দেউলে হলেন, শেষটা পরেশবাবু জলের দরে তাঁর ব্যাবসাটি কিনে নিলেন— এর জন্যে পরেশবাবুর নিন্দা না করে বরং তারিফই করতে

হয়। অথচ নকুলটা এমন ভাব দেখায় যেন পরেশবাবুই অজানেশের ব্যাবসাটি লাটে তুলে দিয়েছিলেন। আরে বাপু, ব্যাবসা করতে গেলে সবাই অমন অল্প-বিস্তর চালাকি করে থাকে; তাই করতে হয়, নইলে অজানেশের মতো ব্যাবসা তুলে দিতে হয়। সেই যে দেউলে হয়ে অজানেশ দেশে ফিরে গেল আর পরেশবাবুর সঙ্গে দেখা হয়নি; মরলও অকালে।

একরকম বর্মীই হয়ে গেছিলেন পরেশবাবু, তারপর অদৃষ্টের ফেরে প্রায় খালি হাতে দেশে ফিরেছেন। মজার কথা হল যে হানাবাড়িটা আসলে অনিমেষদেরই পৈত্রিক বাড়ি, পঁয়ত্রিশ বছর খালি পড়ে ছিল, নাকি ভূতের উপদ্রব! কেউ বাস করতে তো রাজি নয়ই, এমনকী সন্ধ্যের পর ওইদিকে যেতেও চায় না। অনিমেষ মামাবাড়িতে মানুষ, পৈত্রিক বাড়ির ধার ধারে না, ইদানীং এখানে পোস্টেড্ হয়েছে, কোয়ার্টারে থাকে, ক্লাবে আড্ডা দেয়। অনিমেষের সেইখানেই পরেশবাবুর সঙ্গে আলাপ। আগে বাপের কাছে তার নাম শুনেছিল বটে, কিন্তু দেখেনি কখনো। পরেশবাবু প্রায় তিরিশ বছর ধরে বর্মা থেকে ফিরে মাসতুতো ভাইয়ের বাড়িতে উঠেছেন। এখানেই ছোটোখাটো একটা ব্যাবসা ফাঁদবেন বলে কিছু মূলধনের চেষ্টায় আছেন। এমন সময় এই সুযোগটি, বলতে গেলে ভগবানই জুটিয়ে দিলেন। অনিমেষ বলে বসল যে ভূতে বিশ্বাস করে না, ওবাড়িতে ভূতের উপদ্রব আছে একথাও সে বিশ্বাস করে না, এমনকী কেউ যদি বাজি ধরে তো ভূতের বাড়িতে একলা রাত কাটিয়ে সে একথা প্রমাণ করে দিতে প্রস্তুত।

ব্যস, ক্লাবে যেমন কথায় কথা বেড়ে থাকে, দেখতে দেখতে পরেশবাবুর সঙ্গে অনিমেষের পাঁচশো টাকা বাজি ধরা হয়ে গেল।

অনিমেষ ভূতে বিশ্বাস না করলেও, দেখা গেল যে নকুল যথেষ্ট করে। সে হাঁউমাউ করে বলে উঠল, 'ফট্ করে যে বাজি ধরছ অনিদাদা, আছে তোমার পাঁচশো টাকা?' ক্লাবের বাবুরা অমনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আরে আমরাই না হয় ধার দেব, তুই ভাবিসনে নকুল।' অনিমেষ বললে, 'তুমিও যেমন নকুলদা, আগে বাজি হারি, তবে তো টাকা দেবার কথা উঠবে। বিছানা বালিশ নিয়ে গিয়ে কেমন দিব্যি নিশ্চিন্তে সেখানে রাত কাটিয়ে, পরেশকাকার কাছ থেকে পাঁচশো টাকা বাগাই, দেখো!'

নকুল তবুও ক্যাঁও ম্যাও করতে থাকে— 'আজ তোমার মা বেঁচে থাকলে, ভূতের বাড়িতে রাত কাটাতে দিত তোমাকে? শেষটা যদি সত্যিই ভূতে ধরে?' একগাল হেসে অনিমেষ বললে— 'দ্দু! দ্দু! কী যে বল! ভূতটি নাকি আমার বাবার পিসি, তার বিয়ের রাতের লাল চেলি আর এক গা গয়না পরে দেখা দেয়; পরদিন ভোর থেকেই তাকে আর কেউ নাকি দেখেনি। নতুন বরটিও অমনি দানের জিনিস, পণের টাকা নিয়ে পাশের গাঁয়ে আবার বিয়ে করেছিল! সাক্ষাৎ বাপের পিসি, সে কি আমার কোনো অনিষ্ট করতে পারে নাকি যে, তাকে দেখে ভয় পেয়ে বাড়ি ছেড়ে পাঁচশো টাকা বাজি হারব! তোমার কোনো ভয় নেই। অন্য ভয় আমারই বরং একটু আছে; ও পরেশকাকা, আছে তো আপনার পাঁচশো টাকা?— শেষটা মিনি-মাগনায় আজকে ভূতের বাড়িতে রাত্রিবাস করাবেন না তো?'

তাই শুনে ক্লাবের সকলের কী হাসি, যেন ভারি মজার কথা বলেছে! ঝপাং করে টেবিলের উপর মনিব্যাগ ফেলে দিয়েছিলেন পরেশবাবু। পাঁচশোই আছে তাঁর, তাছাড়া সামান্য কিছু জমানো টাকা। বলেছিলেন— 'তোমার পাঁচশো পেলেই, আমার ব্যাবসাটি শুরু করে দেব! আপনাদের সব হালখাতার নেমন্তন্ন রইল, তুমিও যেয়ো অনিমেষ।'

পরেশবাবুও ভূত-টুত মানেন না। তবু বাছাধনকে যে পৈত্রিক বাড়িতে রাত কাটাতে হচ্ছে না, সে বিষয়ে তাঁর মনে কোনো সন্দেহটুকু নেই, তার কারণ হল অতি উত্তম ফরমায়েসি ভূতের ব্যবস্থা হয়েছে। বর্মার সেকালের গ্রেট বেঙ্গল থিয়েটারের বটকেষ্ট যেমন খাসা ভূত হতে পারে,

সত্যিকারের ভূত বলে যদি কিছু থাকত তো তারাও অত ভালো হত না। এমন মেয়ের সাজ করতে পারে বটকেষ্ট যে, নিজের চোখকে বিশ্বাস করা যায় না। আজ রাতে সে লাল চেলি পরবে, গা থেকে উদ্ভুত আলো বেরুবে, আবার দপ্ করে নিবে যাবে, অমনি ভূত অদৃশ্য হয়ে যাবে! হরেকরকম ভুতুড়ে আওয়াজও দেবে বটকেষ্ট; তার কতক কতক শুনেও এসেছেন পরেশবাবু। বাবাঃ, দিন দুপুরে কেষ্টনগরের এক হাট লোকের মাঝখানেও তাই শুনে পিলে চমকে গেছিল! সে কথা মনে করে এখন আবছা অন্ধকারে নিশ্চিন্তমনে অনিমেষকে হানাবাড়িতে ঢুকতে দেখে, অনেক কষ্টে পরেশবাবু হাসি চাপলেন।

এবাড়িতে যে ভূত-টুত নেই, সব যে গাঁয়ের দুষ্টু লোকের কল্পনা, সেটুকু জানতে পরেশবাবুর বাকি ছিল না, যেহেতু বর্মা থেকে ফিরেই, প্রথম রাতটি কিছু জেনেশুনে, এই বাড়িতেই নিশ্চিন্ত না হলেও, একেবারে নির্বিঘ্নে ঘুমিয়ে কাটিয়ে ছিলেন। তারপর সকালে মাসতুতো ভাইটিকে খুঁজে বের করেছিলেন। অবিশ্যি ভূত না থাকলেও, বাড়িটা যে যথেষ্ট ভুতুড়ে সে কথা মানতে হবে। ছাদ থেকে লম্বা লম্বা ঝুল ঝোলে; আচমকা যখন নরম একটি ছোঁয়া লেগে যায় কপালে, আঁতকে উঠতে হয়। দরজা জানলার কব্জা ভাঙা, সে যে কত রকম ক্যাঁচকোঁচ শব্দ হয় সে ভাবা যায় না। তার ওপর ঘুলঘুলির মধ্যে দিয়ে খালি বাড়িতে হাওয়া ঢুকে কী রকম একটা হু হু শব্দ করে যে শুনলে হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যায়। সত্যি কথা বলতে কী, ভূতে অবিশ্বাস এবং ফুঙির দেওয়া ভূতের মাদুলি না থাকলে, ভূতের কথা না জেনেও, পরেশবাবু ও বাড়ি রাত কাটাতে পারতেন কিনা সন্দেহ।

আজকে এ সবরে উপরে বটকেষ্ট ভূত তো আছেই। তাকে পইপই করে বলে দেওয়া হয়েছে যেন লোমশ হাতু দু-টোকে চেলি দিয়ে ঢেকে রাখে। মুখে সে এমনি মেক্-আপ দেবে যে কারো বাবার সাধ্যি নেই নকল ভূত বলে টের পায়।

অনিমেষ সঙ্গে করে বিছানা এনেছে, তাছাড়া একটা গামছা না কী যেন এনেছে, মাটিতে বিছানা পাততে হবে, বাবু তাই মেজেটাকে বোধ করি ঝেড়ে ঝুড়ে নেবেন। একটা টর্চও এনেছে নিশ্চয়, মোমবাতি, দেশলাইও এনেছে হয়তো। সেটি জ্বেলে শুয়ে শুয়ে অদ্ভুত সব শব্দ শুনবে ব্যাটাচ্ছেলে, আর গায়ের রক্ত হিম হয়ে উঠতে থাকবে। তারপর আড়ালে দাঁড়িয়ে বটকেষ্ট একটা বেলুন থেকে কী একটা গ্যাস ছাড়বে। অমনি নাকি মোমবাতির আলো বেড়ে এক হাত উঁচু হয়ে উঠবে! চমকে ব্যাটা উঠে বসবে, আর সেইরকম হু হু করতে করতে পিসির ভূত দেখা দেবে! তারপর মোমবাতিটা যেই কমতে কমতে একেবারে নিবে যাবে, পিসির ভূতও অদৃশ্য হবে আর অনিমেষ-বীরও চোঁ-চোঁ দৌড় লাগাবে। উঃ, ভেবেও কী সুখ! এই সুখ ভোগ করবার জন্যেও অনিমেষ যাতে কোনো চালাকি না করে, তাই পরেশবাবু এখানে আজ লুকিয়ে বসে আছেন। সিঁড়িতে একটা খস্ খস্ শব্দ শুনে চমকে ফিরে আঁতকে উঠলেন পরেশবাবু। কী চমৎকার ভূত সেজেছে বটকেষ্ট! আরেকটুকু হলে তিনি নিজেই ভাড়া করা ভূত দেখে, মাদুলি সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও নির্ঘাত মূর্ছা যেতেন। সড় সড় করে নিঃশব্দে লাল চেলি পরা মূর্তিটা সিঁড়ি দিয়ে নেবে গিয়ে নীচের হল ঘরে ঢুকল। সেইখানে অনিমেষ শুয়ে আছে। উত্তেজনায় পরেশবাবুর দম বন্ধ হয়ে আসবার জোগাড়। বাবা, কী ওস্তাদ ওই বটকেষ্টটা, এমনি নিঃশব্দে কাজ করে যে কখন যে এসে পৌঁছল এতটুকু টের পাননি পরেশবাবু। এমনকী মনে মনে একটা ভয়ই হচ্ছিল যদি কেষ্টনগর থেকে এতটা পথ আসতে গিয়ে, কোনো দুর্ঘটনা হয়ে থাকে! যাক, এবার সব ভাবনা ঘুচল, কাল হাতে-নাতে পাঁচশোটি টাকা পাওয়া যাবে।

নৈঃশব্দ্য ভেদ করে বিশ্রী একটা হু-হু শব্দ কানে এল; গায়ের রক্ত জল হয়ে গেল পরেশবাবুর। উঃ, কী বাড়াবাড়িটাই করতে পারে বটকেষ্ট পঁচিশ টাকার জন্যে! অনিমেষের কোনো সাড়া শব্দ নেই

কেন? যদি— যদি ভয়ে হার্টফেল্ করে মরেই যায়? এমনও তো শোনা গেছে কত সময়। পরেশবাবুর বুকটা এতটা টিপটিপ করতে লাগল। তাহলে তো এত কষ্ট, এত খরচ করেও সব পণ্ড হয়ে যাবে! টাক দেবে কে?

হঠাৎ চেয়ে দেখেন দোর গোড়ায় বটকেষ্ট, অর্থাৎ লাল চেলি পরা মূর্তিটি, তার গা থেকে কেমন একটা সাদা আলো বেরুচ্ছে, ফসফরাস না কী যেন। এইরকমই কথা ছিল, অনিমেষকে ভাগিয়ে বটকেষ্ট উপরে এসে পরেশবাবুকে ডেকে নিয়ে যাবে, যাতে অনিমেষের পলায়নের আরেকজন বাইরের সাক্ষীও থাকে। কিন্তু বটকেষ্ট অমন চুপ করে দাঁড়িয়ে কেন? গলা খাঁকরে পরেশবাবু বললেন— 'কী বটকেষ্ট? কথা বলছ না কেন?'

মূর্তিটি হেসে উঠল, খিল খিল করে মেয়েলি সুরে; তারপর দু-হাত বাড়িয়ে নিঃশব্দে পরেশবাবুর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। পরেশবাবুর সর্বাঙ্গ বেয়ে বরফের মতো ঠান্ডা ঘাম ঝরতে লাগল। সেই সাদা আলোতে স্পষ্ট দেখতে পেল এ তো বটকেষ্ট নয়, এর হাতে ঘন কালো লোম নেই, যেন মাখনের তৈরি ফর্সা সুন্দর ছোট্ট দু-খানি হাত।

অজ্ঞান হয়ে পড়তে পড়তে সামলিয়ে নিলেন পরেশবাবু, গলা দিয়ে স্বর বেরুল না। হঠাৎ ফিরে দুড়দাড় করে পেছনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে, বন-বাদাড় ভেঙে দূরে যেখানে গাঁয়ের বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে সেদিকে ছুটলেন।

পরদিনটি রবিবার। সকালে গাঁ সুদ্ধু লোকের মুখে শোনা গেল পরেশবাবু বাজি হেরে রাতারাতি কোথায় সরে পড়েছেন। তাঁর মাসতুতো ভাই কেদার মিত্তির নাকি চারদিকে তাঁর খোজ করছে শুনে ক্লাবে মহা হইচই, এদিকে ফিস্টির ফর্দ তৈরি; এগারোটায় সকলের ক্লাবে জমায়েত হবার কথা। নকুলের সে কী রাগ! 'এ কীরকম ভদ্রলোক! বাজি হেরে ফাঁকি দিয়ে পালানো! না; ওনাকে ছাড়া হবে না, যেখান থেকে হোক, চ্যাংদোলা করে ধরে আনা হবে। কী অনি-দাদা, তুমি কেন চুপ, লোকসান তো তোমারই!'

অনিমেষ একটু হেসে বললে— 'না, নকুলদা, সত্যি কী আর ওঁর টাকা নিতাম আমি, ওইটুকু ওঁর সম্বল। শুধু একটু জব্দ করার ইচ্ছে ছিল। তা উনি করেছিলেন কী, গ্রেট বেঙ্গল থিয়েটারের বটকেষ্ট কাকাকে ভূত সেজে আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে টাকা দিয়ে এসেছিলেন। বটকেষ্ট কাকা বাবাকে বড়ো ভালোবাসতেন, উঠি-পড়ি করে কেষ্টনগর থেকে ছুটতে ছুটতে আমাকে খবরটা দিয়ে গেলেন। তাছাড়া এও বলে গেলেন যে, রাত দুপুরে ভূতের বাড়িতে একা যাবার ওঁর সাহস নেই, যদিও পরেশকাকাও সেখানে থাকবেন, তবু বটকেষ্ট কাকা সাদু কাকিকে সঙ্গে নেবেন। টাকা নিয়েছেন, কাজেই উনি আমাকে নিশ্চয়ই ভয় দেখাবেন; সাদুকাকিও সেই সময়টি নষ্ট না করে ঠিক একই রকম সাজ করে পরেশকাকাকে ভয় দেখাবেন। বিনি পয়সায়, যাতে কেউ না বলতে পারে আমিও ভূত ভাড়া করে চালাকি করছি। দারুণ ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছেন নাকি পরেশকাকা, সাদুকাকির কাছে শুনলাম। কিন্তু এখন ভয় হচ্ছে কোনো বিপদে পড়েননি তো? নিখোঁজ কেন?'

কেদার মিত্তির কাষ্ঠ হাসি হেসে বললে, 'বিপদে পড়লে তার সুটকেস আর আমার নতুন আলোয়ান নিয়ে অদৃশ্য হতেন না। তুমি নিশ্চিন্ত হও। সে কলকাতায়, ভূতের হাত থেকেও বেঁচেছে, পাঁচশো টাকাও বেঁচেছে। এখন ক্ষতিপূরণ আমাকে কী খাওয়াবে, খাওয়াও।'

সাগর পারে

ছোটোবেলায় একবার পুরীতে গিয়ে একেবারে সমুদ্রের ধারে একটা ছোটো বাড়িতে ছিলাম। সারারাত ঘুমোয় কার সাধ্য। গুম-গুম করে বিরাট ঢেউগুলি অনবরত বালির ওপর আছড়ে ভাঙছে, আবার শোঁ-শোঁ শব্দ করে জল সরে যাচ্ছে।

জানলা দিয়ে চেয়ে দেখতাম, ভাঁটার সময় জলের ধারে ধারে ফসফরাস কেমন চিকচিক করছে, ওদের ওপর জলের ছিঁটে পড়ছে, আর ওদের গা-ও চিকচিক করে উঠছে। দূর থেকে কেউ আসছে, কী করে যেন টের পায় কাঁকড়ারা, আর অমনি সে-লোকটা দেখা দেবার আগেই, যে যার গর্তে লুকোয়। যারা গর্তের ভেতর বসে বালি কুরে কুরে বাইরে ফেলছিল, তারাও সব চুপ করে যায়। তারপর লোকটি চলে গেলে আবার হাজার হাজার কাঁকড়া বেরিয়ে এসে সামনের দিকে না এগিয়ে পাশ বাগে ছুটোছুটি করতে থাকে। মানুষকে ওদের ভারি ভয়।

তা হবে না-ই বা কেন ? কতদিন সকালের দিকে দেখতাম, কাঁকড়া ধরে, দাঁড়ায় দাঁড়ায় জড়িয়ে মালা গেঁথে নুলিয়ারা বাড়ি বাড়ি বেচছে। ওই দিয়ে নাকি খাসা ঝাল চচ্চড়ি হয়, তাই বালি খুঁড়ে বাসার ভেতর থেকে ওদের টেনে বের করে মালা গাঁথা হয়।

ওই নুলিয়ারাও একরকম বলতে গেলে সমুদ্রের জীব। কী চেহারা এক এক জনার! কালো কুচকুচে যেন কষ্টিপাথর দিয়ে খোদাই করা শরীর। রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করে, ইটের মতো শক্ত দেহ হয়ে গেছে ওদের।

শুনেছিলাম সমুদ্রের ওপারে বহুদূরের সব দ্বীপপুঞ্জ থেকে এসেছে ওরা। লম্বা লম্বা নৌকো চেপে, প্রাণ হাতে করে এসে, সব এই বিদেশ বিভুঁয়ে থেকে গেছে।

জলের ধারে ওদের গাঁ-ও দেখেছিলাম। বাড়িগুলির চারপাশে ছোটো ছোটো ঢিবি সব মন্দিরের মতো ছড়ানো আছে। সেখানে ওদের দেবতাকে ওরা পুজো দেয়। সমুদ্রে যারা গেছে, তারা যেন আবার ফিরে আসে। প্রকৃতির একেবারে বুকের মধ্যে যারা বাস করে তারা জানে যে, বড়ো বিপদ এলে, আর মানুষের বুদ্ধি বা শক্তিতে কুলোয় না। তাই ওদের মেয়েরা নিত্যি সেখানে পুজো পাঠায়।

ওদের চোখগুলো যেন সদাই সমুদ্রের ওপারে কী খুঁজছে, এইরকম একটা দূর-দেখা ভাব। জলকে ওরা ভয় করে না। এই জলেই হয়তো ওদের বাপ-ঠাকুরদারা প্রাণ দিয়েছে, তবু জলই ওদের খাওয়ায় পরায়, ওদের প্রাণের বন্ধু।

একবার দেখলাম, সন্ধ্যের দিকে জোয়ার এসেছে। বাতাস বইছে, আর তিনতলা সমান ঢেউগুলো তীরের ওপর আছাড়ি-পিছাড়ি করছে। তারই মধ্যে নুলিয়াদের একটি ছোটো ছেলে আমাদের

বললে জলের মধ্যে একটি পয়সা ছুড়ে দিতে। যেই-না দেওয়া, অমনি সঙ্গে সঙ্গে সে-ও সেই তুমুল জলের রাশির মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। আমাদের বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। কিন্তু এক মিনিটের মধ্যে পয়সা হাতে নিয়ে ছেলেটা জল থেকে উঠে এল। আরও পয়সা দিলাম ওকে আমরা, বার বার করে বললাম, প্রাণ নিয়ে অমন খেলা যেন আর কখনো না করে। হাসল ছেলেটি। আর তখুনি অন্যদের কাছে গিয়ে পেড়াপিড়ি করতে লাগল যেন জলে পয়সা ছুড়ে দেয়। জলের ছেলের জলকে ভয় করলে কি আর চলে।

ভোরে ওরা নৌকো নিয়ে বেরুতো। কাঠ দিয়ে তৈরি লম্বা লম্বা নৌকো, অন্য সময় উপুড় করে বালির ওপর ফেলে রাখত, তলাটাও যাতে রোদ খেতে পারে। তার ছায়ায় বসে দুপুরে ওরা মাছ ধরার জাল বুনত, ছোট্ট একটা বাঁকা মতো মোটা কাঁটা দিয়ে সরু দড়ির ফাঁস জড়িয়ে জড়িয়ে দেখতে দেখতে একখানি জাল বুনে ফেলত।

সকালে উঠে ওদের নৌকো বেরুনো দেখতাম। সে এক ব্যাপার। ঢেউ যখন ডাঙা থেকে ফিরে সব সমুদ্রের দিকে যায়, সে-সময় তার মাথায় চেপে বেরিয়ে যেতে হয়। নইলে মাঝখানকার নীচু জায়গাতে পড়লে আবার ঢেউয়ের সঙ্গে বালির ওপর ফিরে ফিরে আসতে হয়। ভাঁটা ধরতে পারলে আর কোনো ভয় থাকে না; দেখতে দেখতে দিগন্ত ছাড়িয়ে নৌকোগুলি দৃষ্টির বাইরে চলে যায়।

বেলা বারোটা-একটার সময় দেখতাম, ওরা মাছ নিয়ে ফিরেছে। বালির ওপর নৌকো বোঝাই মাছ ঢেলে দিত। কতক চেনাজানা মাছ, কত রকম বিলিতি নাম তাদের। ছোটো ছোটো মিষ্টি স্যামন’, ঝকঝকে রুপোলি ‘ম্যাকরেল’, বিশালাকার তলোয়ার মাছ। তাকে দেখে প্রাণটা কেমন করে পুরু চামড়ায় মোড়া প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে বালির ওপর পড়ে থাকে, হাপরের মতো বুকটা ওঠে পড়ে, আর চোখে সেকী নিদারুণ বেদনা।

আমাদের নুলিয়া আড়াইয়া বলত— ‘বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে হয় না ওর দিকে, মুখের ভাত ছাইয়ের মতো লাগবে। দুঃখ কি শুধু মানুষদেরই ভাবো তোমরা?’

চেনা মাছের সঙ্গে অদ্ভুত সব রং করা, শুঁড় বের করা জন্তু নিয়ে আসত আড়াইয়া। বড়ো ঢেউ চলে গেলে পর বালির ওপর থেকে কুড়িয়ে আনত চার ইঞ্চি সমুদ্রের ঘোড়া। তার ঠ্যাং খুর কিছু নেই, আছে শুধু ঘোড়ার মতো একটা মাথা আর পাকানো একটা ল্যাজ। আর আনত তারা মাছ, তাকে হঠাৎ দেখে জানোয়ার বলেই মনে হয় না। হাতে নিতেই মাঝে মাঝে সমুদ্রের ঘোড়া, তারা-মাছ কিলবিলিয়ে উঠত। আমরা বলতাম ‘আহা, জ্যান্ত আছে, আড়াইয়া। দাও, আবার জলে ফেলে দাও, নইলে এখুনি মরে যাবে।’

আড়াইয়া হাসত আর বলত— ‘ওর নাম লোকসানের খাতায় লেখা হয়ে গেছে, ও আর বাঁচবে না! সমুদ্রে ফেলে দিলেও ঢেউগুলো এখুনি ওদের আবার বালির ওপর আছড়ে ফেলবে। গভীর জলের জানোয়ার কি কখনো হাঁটু জলে বাঁচে?’

সত্যি বাঁচে না। একদিন একটা সমুদ্রের সাপ দেখেছিলাম, বড়ো ঢেউয়ের সঙ্গে এসে বালির ওপর অনেকটা তফাতে পড়ে আছে। হলুদ আর ঘোর সবুজ ডোরা-কাটা, পাঁচ-ছয় হাত হয়তো লম্বায়। চোখের ওপরে শিং-এর মতো একটু উঁচু মতন। নড়তে পারছে না বালির ওপর। নুলিয়ারা বাঁশের লাঠিতে ঝুলিয়ে তিন-চার জনে মিলে ধরে নিয়ে গেল।

তাই দেখে মনটা খারাপ লাগছিল। আড়াইয়া এসে কাছে বসে বলল, ‘সাপটার জন্য দুঃখু হচ্ছে বুঝি? জলের ধারে যদি থাকতে তাহলে জানতে, যা আসে তা নিয়ে নিতে হয়, যা ভেসে গেল, তার জন্য দুঃখ করতে হয় না।

'আমার বাবার নৌকো একবার জলে ভেসে গেছিল। অনেকদিন মাছ পড়েনি ভালো, বাড়িতে খাবার কষ্ট। আমার ঠাকুমা আর মা তাই নিয়ে খুব রাগারাগি করেছিল। তাই আমার বাবা আর কাকা একদিন সকালে নৌকো নিয়ে অনেক দূরে চলে গিয়েছিল। আর ফেরেনি।'

'মা আর ঠাকুমা কেঁদে কেঁদে সারা, কিন্তু ঠাকুমার ছোটো ভাই খালি বলে, 'আমি হাত গুণে দেখেছি, ওদের ছাই এখানকার মাটিতে মিশবে।' আমি তখন খুব ছোটো, ঠাকুমা আর মা আর ঠাকুমার ওই ভাই কত কষ্টে আমায় মানুষ করতে লাগল। এমনি করে এক বছর প্রায় কেটে গেল। একদিন খুব ঝড় উঠল, সে ঢেউ তোমরা ভাবতেও পারো না। বালি ডিঙিয়ে ওপরের ওইসব সরকারি রাস্তা পর্যন্ত ঢেউয়ের মাথার ফেনা ছিটকে পড়তে লাগল।'

'সারারাত ঝড় চলল, ভোরের বেলায় সব ঠান্ডা হয়ে গেলে আমি বালির ওপর কাকার জলের বোতল কুড়িয়ে পেলাম। তার মধ্যে বাবার হাতের মাদুলি ভরা। তাই দেখে মা, ঠাকুমা এমনি কান্নাকাটি জুড়ে দিল যে, বুড়ো মামা আর তার ক-জন মজবুত বন্ধু দু-তিনটে নৌকো নিয়ে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ল। ঠিক দশদিন পরে বাবা কাকাকে নিয়ে ফিরে এল।'

'আমরা আড়াইয়াকে ঘিরে ধরতুম— 'কোথায় গেছিল বল আড়াইয়া, এক বছর কোথায় ছিল?'

'কাকা বলে জলের নীচে যে অনেক সময় লুকোনো টান থাকে, তারি মধ্যে নাকি ওরা পড়ে গিয়েছিল। দু-দিন ভেসে, না খেয়ে, রোদে পুড়ে, ঢেউয়ে ভিজে, সমুদ্রের মাঝখানে একটা পাথুরে দ্বীপের ওপর আছড়ে পড়ল ওদের নৌকো। তলা ভেঙে গেল, আর ভাসে না। দ্বীপে একটু তক্তা নেই যে জুড়ে নেবে। আছে শুধু ঝোপ-ঝোপ আর হাজার হাজার পাখির বাসা। ঝোপঝাপে অচেনা সব ফল, রাঙাআলুর মতো একরকম জিনিস, একটা মিষ্টি জলের ঝরনা, পাথরের ফাঁকে ফাঁকে ছোটো ছোটো নোনা জলের পুকুর, তাতে নানারকম মাছ।'

'না খেয়ে মরবার ভয় ছিল না, কিন্তু মানুষের মুখ না দেখে তারা হাঁপিয়ে উঠছিল। তখন একদিন কাকা বলেন, 'এই স্রোত তো উত্তর দিকে যায়; জাহাজের খালাসিদের কাছে শুনেছি, বোতলের মধ্যে চিঠি পুরে সাহেবরা নাকি ভাসিয়ে দিত। এক হাজার মাইল দূরেও সে-সব বোতল কত সময় ভেসে উঠত।' ওরা লিখতে পড়তে জানে না। কাগজ নেই, কলম নেই; তাই কাকার জলের বোতলে বাবার মাদুলি পুরে ভাসিয়ে দিল। সেই বোতল ছ-মাস বাদে আমি কুড়িয়ে পেলাম।'

'সমুদ্রের মাঝে মাঝে ওই রকম পাথুরে দ্বীপ আছে এ দিকে, জাহাজগুলো খুব সাবধানে তাদের বাঁচিয়ে চলে। মামার জেদ চেপে গিয়েছিল, হাত গুণে সে দেখছে, বাবা-কাকা ঘরে মরবে। একটার পর একটা— দশটা দ্বীপ খুঁজে বাবা-কাকাকে ঘরে ফিরিয়ে আনল। মরেও যেমন লোকে, আবার বাঁচেও তেমনি।'

আড়াইয়া তার গলায় বাঁধা কালো সুতোয় গাঁথা একটা পলা আর একটা মুক্তো দেখিয়ে বললে— 'এটা আসল মুক্তো, ওই দ্বীপে ঝিনুকের মধ্যে বাবা পেয়েছিল। এদিকে নাকি মুক্তোর চাষ হয় না, তাই ওরা দলবল নিয়ে পরে দ্বীপগুলোতে অনেক খোঁজাখুঁজি করেছিল, কিন্তু আর পায়নি। কাকা বলে ওই দ্বীপটাকেই আর ওরা খুঁজে পায়নি। অমনি নাকি সাগর থেকে মাথা তুলে ওঠে, আবার কোনোদিন টুপ করে সাগরের বুকে তলিয়ে যায়।'

গল্প শুনতে শুনতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। আড়াইয়া বললে— 'চলো তোমাদের ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি। আজ তোমাদের মাংস রান্না হচ্ছে দেখে এসেছি, দেখি মা যদি আমাকেও দেয়।'

বড়োলোক হবার নিয়ম

গত বছর ফুটবল সিজনের শেষের দিকে মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের খেলা। টিকিট পকেটে গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। ছোট্‌কা এলে একসঙ্গে ঢুকব, এমন সময় একজন অচেনা লোক এসে কানে কানে বলল, ‘বড়োলোক হতে চাও?’

বাড়িতে সর্বদাই সবাই বলে— অচেনা লোককে বিশ্বাস করতে হয় না, তাই মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। লোকটাও অমনি ফস্‌ করে ঘুরে ওপাশে গিয়ে ও কানে বলল, ‘বড়োলোক হতে চাও না, যেখানে খুশি সেখানে যাবে। হাতঘড়ি, পার্কার কলম-পেন্সিলের সেট, ট্র্যানজিস্টর রেডিয়ো, রঙিন ছবি তোলা ক্যামেরা, বাইনোকুলার— তবে কি এসবও চাও না নাকি?’

আমি বললাম— ‘না।’

লোকটা অবাক হয়ে গেল। ‘না, না আরও কিছু, খুব চাও। বড়ো বড়ো কুমিরের চামড়ার স্যুটকেস বোঝাই ভালো ভালো কাপড়-চোপড় থাকবে; জুতোই থাকবে সাত জোড়া’ এই বলে আমার পুরোনো জুতো জোড়ার দিকে একবার তাকিয়ে নিল। আমি পা সরালাম। তাতে সে বলল, ‘কেমন শীতের সময় সুইটজারল্যান্ডে যাবে, পায়ে লম্বা লম্বা স্কি বেঁধে বাঁইবাঁই করে পাহাড়ের গা বেয়ে নামবে; পাহাড়ে ছাগলরা হাঁ করে তাকিয়ে দেখবে। তারপর নীচে হোটেলের গরম ঘরে লাল, নীল, হলুদে, সবুজ চকড়াবকড়া মোটা সোয়েটার পরে গরম কফি আর হরিণের মাংসের প্যাটি খাবে— চাও না এসব?’

আমি বললাম, ‘না। ঠান্ডা লাগলে আমার সর্দি হয়।’

সে দুঃখিত হয়ে বলতে লাগল, ‘শীতের সময় না হয় হাওয়াই দ্বীপেই যেয়ো। যেখানে ঠান্ডার কোনো ভয় নেই। চারদিকে নীল সমুদ্রের ঢেউয়ের মাথায় সাদা ফেনার ঝুঁটি। বালির ওপরে নারিকেল গাছের তলায় বসে আনারসের শরবৎ খেয়ো। মাঝে মাঝে নৌকো করে জেলেদের সঙ্গে রেডিয়ো, কেমন পরিষ্কার জলের নীচে রং-বেরঙের প্রবালের পাশ দিয়ে সব সমুদ্রের জীবদের সাঁতরে যেতে দেখবে। চাও না এসব দেখতে?’

আমি হাঁ করে তার দিকে চেয়ে রইলাম। চোখ দুটো কটা মতো, দাড়িগোঁফ কতকাল খেউরি হয় নি।

সে বললে, ‘নরওয়ে যাবে না? মাঝ রাতে সূর্য ওঠা দেখতে ইচ্ছে করে না? আকাশটা বেগনি রং ধরে, তাতে ফিকে সোনালির ছটা লাগে আর সূর্যটা মাটি থেকে একটু উঁচুতে আকাশের চারিদিকে কেবলি ঘুরতে থাকে। দেখবে না?’

আমি জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজালাম।

সে বললে, 'নায়গারা জলপ্রপাত দেখবে না? সেখানে অষ্টপ্রহর রামধনু লেগে থাকে। ওল্ড ফেথ্‌ফুল বলে ওখানে একটা গরম জলের ঝরনা আছে, সাতান্ন মিনিট পর পর তার মুখ থেকে গরম জলের ফোয়ারা বেরোয়, চাও না সেখানে যেতে?'

আমি একবার নাক চোখ মুছে নিলাম।

লোকটা বললে, 'তাহলে মিশর দেশে চলো-না। প্রাচীনকালের রাজাদের সমাধি কেমন ধনরত্ন দিয়ে ঠাসা থাকে দেখবে। গ্রিসের দু-হাজার বছরের পুরোনো মূর্তি দেখবে না? ওখানকার ভাঙা থিয়েটারে এককালে সিংহ দিয়ে মানুষ খাওয়ানো হত, তা জানো? প্যারিসের আইফেল টাওয়ার দেখবে না?'

আমি দু-হাত দিয়ে মুখ ঢাকলাম।

সে বললে— আর সে কী খাওয়ার ধুম! একবার তার স্বাদ পেলে এসব ডাল ভাত চচ্চড়ি আর কোনোদিন মুখে রুচবে না! তন্দুরিতে রান্না হাঙরের কাবাব, দুধ আর পনীর দিয়ে সেদ্ধ বাচ্চা অক্টোপাস, কচি কচি ব্যাঙের ঠ্যাঙ, বরফের পিপে থেকে তুলে লেবুর রস দিয়ে জ্যান্ত ঝিনুক, কত সময় খেতে গিয়ে দাঁতে মুক্তো কামড় পড়ে।'

আমার জিভে জল এল।

লোকটা বললে, 'হনলুলুর কাছে সমুদ্রের ধারে ওরা যখন চড়িভাতি করে, পদ্মপাতায় জড়িয়ে সরু চালের ভাত কচি শুয়োরের মাংসের সঙ্গে নারকোল দিয়ে মেখে, আগুনে তাতানো পাথরের উপর, গরম বালির নীচে পুঁতে রান্না করে। যে একবার খেয়েছে সে আর ভোলে না। এ সমস্তই তোমার মুঠোর মধ্যে।' এই বলে ফোঁস করে সে একটা নিশ্বাস ফেলল।

আমি বললাম, 'টাকা লাগবে না?'

'লাগবেই তো। এখান থেকে শুকনো মুখে কালীঘাট যেতে দশটা পয়সা লাগে, আর এতে লাগবে না, তাই কখনো হয়? কিন্তু টাকা পাওয়াটা এমন আর কী শক্ত ব্যাপার? যে-কেউ টাকা করতে পারে, কেন করে না সেটাই বরং আশ্চর্য!' আমি তার চামড়ার তাপ্পি লাগানো ছেঁড়া জার্কিন, নীল রঙের ময়লা পেন্টেলুন আর জঘন্য ক্যাম্বিশের জুতোর দিকে তাকাতেই সে বলল, 'ওঃ, এই দেখেই ঘাবড়াচ্ছ? পয়সা কখনো জাহির করতে হয় না, তা হলে রাজ্যের ফেউ পাছু নেয়। পয়সা থাকবে পকেটে লুকোনো, এই দ্যাখো।' এই বলে পকেট থেকে নস্যি লাগা দুর্গন্ধ রুমালের গিঁট খুলে বড়ো বড়ো সবুজ পাথরের একছড়া মালা দেখাল। কাষ্ঠ হেসে বলল, 'এগুলো আসল পান্না, কম করে এটার দাম এক লক্ষ টাকা। এই রকম হাজার হাজার মালা আমার আছে। তোমারও খুব সহজেই থাকতে পারে। চাই কী এটাই তোমাকে দিতে পারি। অবিশ্যি যদি একটা কাজ করে দাও।'

ফিসফিস করে বললাম, 'কী কাজ?'

লোকটা হাসল! 'অত ভয়ের কিছু নয়, ডাকাতও ধরতে হবে না, কুমিরের সঙ্গেও লড়াই করতে হবে না। স্রেপ্‌ তোমার খেলার মাঠের টিকিটখানা আমাকে দিতে হবে।'

আমি বললাম, 'কেন, তোমার এত টাকা, একটা টিকিটও কিনতে পার না?'

সে বললে, 'আরে রামঃ! আমার ওসব চামড়ার গোলা নিয়ে লাথালাথি দেখবার সময় আছে নাকি? বলে সে সময়টাতে আমার চাই কী হাজার টাকা রোজগার হয়ে যায়। ওটা চাই আমার ওস্তাদজীর জন্য, কামস্‌-কাটকা থেকে মাত্র একদিনের জন্য এসেছেন, কালই ফিরে যেতে হবে, কুড়ি বছর মোহনবাগানের খেলা দেখেননি। এইসঙ্গে বলে রাখি, সেই তোমাকে এক দিনে লক্ষ টাকার

মালিক করে দিতে পারে। একদিন আমিও তোমার মতো ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াতাম, এখন লাখ, লক্ষ টাকার পান্নার মালা কেমন দিব্যি স্বচ্ছন্দে তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি।'

এই বলে আমার পকেট থেকে টুপ্ করে টিকিটটি তুলে নিয়ে, রুমালের পুটলিটা গুঁজে দিল। আমি কী একটা বলতে যাচ্ছিলাম, সে জিভ কেটে বলল, 'এই দ্যাখো, কী ভুলো মন আমার! কোটি কোটি টাকার হিসেব রাখার অভ্যাস, ছোটো জিনিস তাই ভুলে যাই। এই নাও, স্বয়ং ওস্তাদজীর হাতে লেখা বড়োলোক হবার অব্যর্থ উপায়, নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে পড়ে দেখো।'

আমার হাতে একটা শীলমোহর করা হলদে খাম দিয়ে লোকটা গেটের ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। দশ মিনিট বাদে ছোট্‌কা এসে সব শুনে চটে কাঁই! 'তুই এরকম একটা ইডিয়ট্ জানলে অত কষ্ট করে তোর জন্য টিকিট জোগাড় করতাম না! ওইরকম সবুজ কাচের মালা শান্তিনিকেতনের মেলায় খুকুরা সাঁইত্রিশ পয়সা দিয়ে কিনেছিল! এখন যা, বুড়োআঙুল চুষতে চুষতে বাড়ি যা!'

বাড়ি গিয়ে খাম খুলে দেখি তাতে লেখা— 'মন দিয়ে পড়াশুনা করলেই বড়োলোক হওয়া যায়।'

জাদুকর

স্টেশনের ওয়েটিং রুমে ঢুকে বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পেলাম। সে যে কী দারুণ বৃষ্টি সে আর কী বলব। চারদিক লেপেপুঁছে একাকার, ধোঁয়ার মতো জলের গুঁড়ো উড়ছে, তিরের মতো গায়ে বিঁধেছে। উঃফ, ঘরের মধ্যে ঢুকে বাঁচলাম। ঘরে একটা তেলের বাতি জ্বলছে, দেখি আরামকেদারার ওপরে মাথা থেকে পা অবধি কালো চাদর মুড়ি দিয়ে একটা লোক বসে রয়েছে, মুখটা তার তেকোনা, থুতনি থেকে খোঁচামতন একটু দাড়ি ঝুলছে। সামনে টেবিলের ওপর একটা হলদে-কালো ডোরাকাটা বিরাট বেড়াল, দু-পায়ের ওপর ভর দিয়ে দু-হাত উঁচু হয়ে সটান বসে আছে।

জগাইদা ঘরে ঢুকেই বসে পড়ে বলল, 'এ কোথায় আনলি বল তো? না আছে একটু শোবার জায়গা, না আছে একটু চায়ের ব্যবস্থা। নে, খাবারের থলেটা খোল। এখন ভিজে জুতো পরে আবার আমার সর্দিটর্দি না লাগে। তোকে আমার আনাই ভুল হয়েছে। যা আস্তে আস্তে চলিস, নইলে এতক্ষণে বড়ো স্টেশনে পৌঁছে সাড়ে পাঁচটার গাড়ি ধরে কদ্দুর এগিয়ে যেতাম বল তো।'

জগাইদা জুতো মোজা খুলতে লাগল, আমি খাবারদাবার বের করতে করতে বললাম, 'আসতে তো আমি চাই-ই নি, তুমিই বললে ম্যাজিক শেখাবে, তাই—'

আরামকেদারা থেকে কালো-কাপড়-পরা লোকটি বলল, 'কে ম্যাজিক শেখাবে?'

জগাইদা সেদিকে না তাকিয়েই বলল, 'কে আবার শেখাবে, জাদুকর শেখাবে। নে, তাড়াতাড়ি কর। কতবার না বলেছি যে-সে অচেনা লোকের সঙ্গে ভাব পাতাবার দরকার নেই!'

এই অবধি বলেই জগাইদা হঠাৎ থেমে গিয়ে হাঁ করে লোকটার দিকে চেয়ে রইল। আমিও সেদিকে ফিরে একেবারে হাঁ! লোকটা উঠে দাঁড়িয়েছে, গায়ের চাদর খসে গেছে, তার তলা থেকে বেরিয়ে পড়েছে কুচকুচে কালো গায়ে-আঁটা পেন্টেলুন আর ঢিলা আস্তিনের কালো কোট, হাতে একটা কালো ছড়ি, হাতলে একটা কুকুরের মাথার খুলি।

সঙ্গে সঙ্গে বেড়ালটাও উঠে দাঁড়িয়েছে, চার পা এক জায়গায় জড়ো করে, পিঠ বেঁকিয়ে দু-হাত উঁচু করে, সবুজ চোখ দিয়ে জগাইদার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

লোকটা যে কী অদ্ভুত একটা হাসি হাসল সে আর কী বলব। মনে হল ছাদের কড়িবর্গাগুলো থেকে খিক্ খিক্ করে তার প্রতিধ্বনি হচ্ছে। জগাইদা একটা ঢোক গিলে আমাকে একটা ছোটো ঠেলা দিয়ে বলল, 'চপগুলো আমি এনেছি, ওগুলো আমাকে দে। তুই পাঁউরুটি দিয়ে পটলভাজা দিয়ে খা। ওই ছোটো সন্দেশটা নিস্। নিখুঁতি একটাই আছে, এদিকে দে।'

লোকটা তখনো খিকখিক করে হাসছে। হাসতে হাসতে বলল, 'খুব ভালো, খুব ভালো, চমৎকার ব্যবস্থা।'

আমার কেমন গা শিরশির করতে লাগল। তার ওপর বাইরে তুমুল ঝড়বৃষ্টি, দরজা জানালা খটখট করে নড়ছে, বন্ধ দরজার ভেতর দিয়ে বিদ্যুতের চমকানি ঘরে ঢুকছে। ছাদ থেকে ঝোলানো তেলের ল্যাম্পটা মাঝে মাঝে দপদপ করে বেড়ে যাচ্ছে, আবার মাঝে মাঝে কমে যাচ্ছে।

জগাইদা কর্কশ গলায় আমাকে বলল, 'হাঁ করে দেখছিস কী? চা আনতে হবে না?'

বললাম, 'এই যে বললে চায়ের ব্যবস্থা নেই, বিশ্রী জায়গা। এত জলঝড়— '

জগাইদা দাঁত খিঁচুতে লাগল, 'জলঝড় তো হয়েছেটা কী? গলে যাবি নাকি? ভারি আমার ব্রতী-বালক হয়েছেন, ছোঃ! উনি শিখবেন ম্যাজিক! তবেই হয়েছে! ওসব হাত সাফাইয়ের ব্যাপারে এত ভয় করলে চলবে না, হ্যাঁ! এই আমি—'

এই অবধি বলতে-না-বলতে অন্য লোকটা একেবারে চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে জগাইদার সামনে দাঁড়াল। রাগে তার চোখে দুটো একেবারে ছোটো ছোটো হয়ে গেছে, মুখটাকে দেখাচ্ছে একেবারে হলুদ! দাঁতে দাঁত ঘসে সে বললে, 'কী বললি? হাতসাফাই? এত বড়ো একটা শাস্ত্রকে এভাবে অপমান কত্তে তোর এতটুকু বাধল না? আবার বলে ম্যাজিক শিখব!'

চা না পেয়ে জগাইদাও রেগে ছিল। সেও তেড়েফুড়ে উঠল। 'হাতসাফাই না তো কী? যতসব বুজরুগি, লোকের চোখে ধুলো দিয়ে পয়সা কামানো। সাদা কাগজে লেবুর রস দিয়ে মন্ত্র লিখে তারপর সেটাকে মোমবাতির উপর ধরে লেখাটা ফুটিয়ে, যত রাজ্যের আহাম্মুকদের অবাক করে দেওয়া। রেখে দিন মশাই, একেবারে কিছুই জানি না ভেবেছেন না কি? আপনার ওই সব সঙের সাজ দেখে এ ছোকরা হাঁ হয়ে যেতে পারে। আমার আর সে বয়স নেই।'

লোকটা বললে, 'কী! সঙের সাজ?'

তখন আমি অবাক হয়ে চেয়ে দেখি বাস্তবিকই পরনে তার সাধারণ কালো কোট-প্যান্ট, হাতে কুকুরের-মাথা-দেওয়া ছড়ি, অদ্ভুত বলতে কোথাও কিছু নেই। কিন্তু একটু আগেও—

লোকটা জগাইদার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল, 'জাদু করতে সাজের দরকার লাগে না, বুঝলে? আমি তোমাকে এক্ষুনি যে-কোনো একটা জানোয়ার বানিয়ে দিতে পারি, তা জান?'

জগাইদা বললে, 'ইল্লি?'

লোকটা আরও ঠান্ডা গলায় বললে, 'এই যে বেড়ালটাকে দেখছ, এটাকে ভালো করে নজর করে দেখো, এ কি সত্যি বেড়াল ভেবেছ না কি? বলে বেড়ালটার পিঠে হাত বুলোতে লাগল। আমি অবাক হয়ে দেখি, এই এক্ষুনি দেখছিলাম হলদে-কালো ডোরাকাটা বেড়াল তার সবুজ চোখ, আর এক্ষুনি দেখছি খয়েরি রঙের একটা খরগোশ— তার পাটকিলে রঙের চোখ।

সত্যি কথা বলতে কী, জগাইদাও একটু চমকে গেছিল। কিন্তু সেটা স্বীকার করবার ছেলেই সে নয়। কাষ্ঠ হেসে বলল, 'ঢিলে জামার আস্তিনে হয়তো গোটা একটা চিড়িয়াখানাই নিয়ে এসেছেন। চাই কী, ওটাকে এখুনি একটা কুকুরছানা করে দিতেই বা আপত্তি কী?'

বরফের মতো ঠান্ডা গলায় লোকটা বললে, 'কোনো আপত্তি নেই।'

দেখতে দেখতে খরগোশটা একটা ঝাঁকড়া-চুল তিব্বতী কুকুর হয়ে গেল। সে আবার এমনি বদমেজাজী যে জগাইদাকে সারা ঘরময় তাড়া করে বেড়াতে লাগল। লোকটা বললে, 'ব্যস, ব্যস, ঢের হয়েছে।' বলে তাকে কোলে তুলে নিল। খুব খানিকটা আদর করে আবার যখন তাকে টেবিলে বসিয়ে দিল, দেখি যে হলুদ-কালো ডোরাকাটা বেড়াল ছিল সেই বিড়ালই রয়েছে, সবুজ চোখ দিয়ে

এদিক-ওদিক তাকিয়ে হাত চেটে মুখ পরিষ্কার করছে। লোকটা আবার আরামকেদারায় পা গুটিয়ে বসে বলল, 'আসলে ও বেড়ালই নয়।'

জগাইদা হেসে বলল, 'বেড়াল নয় তো কী?'

'বেড়াল নয় তো তোমারই মতন একটা উদ্ধত ছেলে। তোমারই মতন পরীক্ষায় ফেল করে, জাদুবিদ্যা শিখতে আমার কাছে এসে আপাতত বেড়াল হয়েছেন। উড়নচড়ে ছেলেদের আমি এইভাবে শায়েস্তা করে থাকি।'

জগাইদা ভীষণ রেগে গেল। তোতলামি করে টরে একাকার, 'ফ-ফেল করে মানে আবার কী? ফেল না করলেও জাদুবিদ্যা শেখা আমার জীবনের স্বপ্ন। প্রকাণ্ড হলঘর থমথম করবে, ঘরময় একটুখানি আলো জ্বলবে, কিন্তু মঞ্চের ওপরে দুটো প্রকাণ্ড বাতি রাতকে দিন করে রাখবে। আর তারই নীচে আঁটো কালো পেন্টেলুন আর ঢিলে আস্তিনের কোট পরে আর মাথায় কালো উঁচু টুপি দিয়ে আমি থাকব, আর আমার উলটোদিকে থাকবে আমার শাক্‌রেদ। আমার হাত-পা বেঁধে চেয়ারে বসিয়ে সামনে পরদা টেনে দেবে, তবু আমি কোঁ কোঁ করে বেহালা বাজাব— কী রে, বড়ো যে হাসছিস?'

কী আর করি, বললাম— 'ইয়ে— মানে হাত-পা খোলা থাকলেও তুমি বেহালা বাজাতে পার না।'

জগাইদা ব্যস্ত হয়ে বলল, 'আরে, তাই তো বলছি, ওইখানেই তো হাতসাফাই বিদ্যে লাগে। ওরা পরদা সরিয়ে দিল, যেমন-কে-তেমন হাত-পা বাঁধা চেয়ারে বসে আছি, বেহালাটা দূরে মাটিতে পড়ে। ওইটেই তো আমাকে শিখতে হবে। ওই বুজরুগিটুকুন।'

লোকটা বললে, 'সব বুজরুগি, না? বুজরুগিটুকু শিখতে পারলেই হয়ে গেল! বাঃ! হুদিনির নাম শুনেছিস, ছোকরা? তাকে হাত-পা বেঁধে প্রকাণ্ড কাঠের বাক্সে পুরে, ছ-ইঞ্চি লম্বা আটচল্লিশটা পেরেক ঠুকে, ওইরকম রাতকে-দিন-করা আলোর নীচে ফেলে রাখা হত। চারধার ঘিরে দর্শকরা বসে থাকত। তবু সে বাক্স থেকে বেরিয়ে আসত। তারপর সে বাক্স খুলতে মিস্ত্রি ডাকা হত। তারা যন্ত্রপাতি দিয়ে পেরেক তুলে, ঢাকনি উঠিয়ে দেখত ভেতরে হাত-পা বাঁধার শেকল পড়ে আছে, হুদিনির রুমাল পড়ে আছে— কিন্তু হুদিনি বাইরে তাকেও কি বুজরুগি বলিস? জানিস, একবার রাশিয়ার জার তোরই মতো ওর জাদুবিদ্যাকে বুজরুগি প্রমাণ করবার জন্যে, হুদিনির হাত-পা শেকল দিয়ে বেঁধে রেলগাড়ির সীল-করা কামরায় পুরে, কামরার বাইরে পাহারাওলা বসিয়ে, রেলগাড়িটাকে সাইবেরিয়া রওনা করিয়ে দিয়ে বলেছিল, রাত আটটার সময় সেজেগুজে আমার সভায় আসবে। রাত আটটায় গাড়ি তখন দুশো মাইল দূরে চলে গেছে, কিন্তু হুদিনি ঠিক সেজেগুজে রাজসভায় এসে হাজির হলেন। টেলিগ্রাফে জানা গেল সীল-করা গাড়ি তখনো সাইবেরিয়ার দিকে ছুটেছে, একবারও থামেনি। কিন্তু গাড়িতে হুদিনি নেই। এই সবই বুজরুগি বলতে চাস?' তারপর কত যে তর্কাতর্কি করতে লাগল দু-জনে। ঘুমে আমার চোখ বুজে আসছিল। আমি অন্য আরামকেদারাটায় শুয়ে সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়লাম।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে চমকে উঠে দেখি, চারিদিক একেবারে চুপচাপ, আলোটা যেন আরও কমে এসেছে, কালো-পোশাক-পরা লোকটা তার চেয়ারে বসে ঢুলছে, তার সামনে একটার জায়গায় দুটো হলদে-কালো ডোরাকাটা বেড়াল। জগাইদা কোত্থাও নেই।

কী আর বলব, আমার সমস্ত চুল খাড়া হয়ে উঠল। লোকটি একটু হেসে বলল, 'কাকে খুঁজছ? এমনি করে আমার বেড়াল বাড়াই। কিন্তু সত্যি করে বলো তো, এই বেশি ভালো না? এতকাল

তোমার ওপর তম্বি করে এসেছে, এখন পরীক্ষা করে দেখতে পার কেমন পোষ মেনেছে। নাও, ভয় কীসের, দেখো যা বলবে তাই করে কিনা?'

আমি বললাম— 'কো—কোনটা সে?' লোকটা শুনে হেসেই কুটোপাটি— 'সে কী আর অত করে বলা যায়? দু-জনকে একই জাদুমন্ত্র দিয়ে এক্কেবারে অবিকল এক করে দিয়েছি যে। আর আলাদা করবার দরকারই বা কী? জোড়া বেড়ালের খেলা দেখাব।' বলে আঙুল তুলে বলল— 'খেল্ দেখাও ভাইসব।' আর বেড়াল দুটো অমনি ওর আঙুল নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কখনো ওঠে, কখনো নামে, কখনো লাফায়, কখনো কিলবিল করে। একবার কুস্তিও দেখাল।

দেখে দেখে আমি তো অবাক। লোকটা বলল, 'ভয় কীসের? এবার সাধ মিটিয়ে ওকে নাচাও। অনেক তো সহ্য করেছ।'

আমি বললাম, 'এই চরকিবাজি খাও দিকিনি।' বলে আঙুল ঘুরিয়ে দেখালাম। তাই দেখে বেড়াল দুচাও চাকার মতো ঘুরতে লাগল। আমি বললাম, 'চোপ।' অমনি তারা থেমে গেল। আমি ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলাম। লোকটা ব্যস্ত হয়ে উঠল।

'ও কী হল ভাই? আমি ভাবলাম তুমি খুশি হবে।' আমি হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলাম। 'বেচারী জগাইদাকে বেড়াল করে দিয়ো না। ও ইঁদুর দেখলে ভয় পায়।'

লোকটা খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে আমার পিঠে হাত দিয়ে বলল, 'আর কেঁদো না, এই দেখো, ওকে আবার মানুষ করে দিচ্ছি। চোখ বুজে মুখ গুঁজে একটু শোও দিকিনি। যা, বিল্লি, যা তো, জগাই হয়ে চা আন; ভোর হয়ে গেছে। নিজের একার জন্য না, আমাদের সকলের জন্য আনিস। স্বভাবটাকে বদলে ফেলিস।'

বলতে-না-বলতে ঘরের দরজা খুলে গেল, পাখিদের কিচিমিচি কানে এল, চোখ খুলে চেয়ে দেখি, জগাইদা সঙ্গে করে চা-ওলা নিয়ে ঢুকছে, রাত কেটে গেছে, বাইরের আকাশ ফর্সা হয়ে গেছে। আর টেবিলের ওপর একটা বেড়াল থাবা চেটে মুখ পরিষ্কার করছে। চমকে গিয়ে লোকটার দিকে চাইতেই সে ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে কিছু বলতে মানা করল।

জগাইদার দেখি মেজাজটা খুব খুশি। ঠোঙায় করে নানখাটাই বিস্কুটও কিনে এনেছে। একগাল হেসে আমাদের খাওয়াল, নিজেও খেল। তারপর আমরা রওনা হবার আগে লোকটাকে ঢিপ করে একটা প্রণাম ঠুকে বলল, 'তাই ঠিক থাকল স্যার, লেখাপড়া শেষ করেই শিখব। চল রে, বাড়িই ফেরা যাক, মা আবার ভাববে।'

শুনে আমি চমকে গিয়ে আধ হাত লাফিয়ে উঠলাম, মাসিমার ভাবনার জন্য জগাইদার এত মাথাব্যথা কবে থেকে হল? লোকটা আমার কানে কানে বলল, 'অবাক হবার কিছুই নেই। কে জানে কোন ছেলেটাকে জগাই করতে কোনটাকে জগাই করেছি।'

জগাইদা বাইরে থেকে ডাক দিল, 'ওরে, আয় রে অনেকটা পথ হাঁটতে হবে যে রে। বড়ো স্টেশনে তোকে লুচি তরকারি খাওয়াব। তাহলে চলি, স্যার।'

আজকাল মাসিমা প্রায় বলেন, 'ওই একবারটি ফেল করে জগাই আমার একেবারে বদলে গেছে, অমন ছেলে হয় না।'

আসলে কতখানি যে বদলেছে তা মাসিমাও জানেন না।

অঙ্ক

এমনি এমনি আমি অঙ্কে এত ভালো হইনি, এর পেছনে একটি রহস্য আছে।

সেই চাঁদে যাবার ব্যাপারটার পর থেকেই, (আমি ছাড়া) আমাদের বাড়ির আর সকলেই যে সেজোমামার উপর হাড়ে চটা হবে তাতে আর আশ্চর্য কী। তাই পরের বছর পুজোর ছুটির ঠিক আগে যখন সে আমাকে খামে চিঠি দিল, 'আমি পাহাড়ে যাচ্ছি কুড়ি দিনের জন্য, আমার সঙ্গে তোর যাওয়া নিতান্ত দরকার, এর যেন অন্যথা না হয়, এই চিঠিকে টেলিগ্রাফ মনে করবি ইত্যাদি ইত্যাদি,'— তখন মনটা খুব আঁকুপাঁকু করলেও বাড়িতে কথাটা স্রেফ চেপে গেলাম। তার অন্য কারণও ছিল।

লুকিয়ে সেজোমামাকে লিখলাম, 'তোমার সঙ্গে কোথাও যাওয়া কত নিরাপদ তা আমার খুব জানা আছে; তাছাড়া টার্মিনেল পরীক্ষার শেষে ওভাবে চিঠি লেখা তোমার উচিত হয়নি, মনের উত্তেজনায় অঙ্কের পরীক্ষায় যা-নয়-তাই হয়ে গেছে। ইত্যাদি।'

আমার বোঝা উচিত ছিল যে অত সহজে ছেড়ে দেবার পাত্রই নয় সেজোমামা। যেদিন পরীক্ষার ফল বেরুল, একরকম শোকের দিনই বলতে হবে, স্বয়ং এসে হাজির। সটাং গিয়ে বাবাকে বলল, 'জাম্বু' ছেলের ভবিষ্যতের জন্য যদি আপনার এতটুকু ভাবনা থাকে তো এমন সুযোগ ছাড়া নয়, কুড়ি দিনের জন্য ওকে আমার সঙ্গে দিন। কার্সিয়ংএ এক বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছি, সময় ভালো, তরিতরকারি, ডিম, দুধ, মুরগি বাড়ি বয়ে দিয়ে যায়। শহর থেকে বেশ দূরে, সিনেমা ও কুসংসর্গের কোনো সম্ভাবনা নেই আর সব চেয়ে বড়ো কথা হল বটুকেশ্বর নন্দী পাশের বাড়িতে থাকেন ও গবেষণা করেন।'

বাবা অবাক হয়ে বললেন, 'কোন বটুকেশ্বর? সেই অঙ্কের ধুরন্ধর নাকি?'

'তা নয় তো কী? জটিল গবেষণার মাঝে মাঝে ডাক্তার তাঁকে এক্সারসাইজ আর হিউমারাস রিলিফ নিতে বলেছে; আপনার ছেলেকে অঙ্ক শেখাতে হলে প্রচুর পরিমাণে দুটোই হবে, এটা তো ঠিক?'

বাবা বললেন, 'তা হয়তো হবে, কিন্তু তোমার মতো বিদ্যে দিগ্‌গজকে এসব পণ্ডিত লোক চেনে কী করে?'

সেজোমামা চটে কাঁই! 'বাঃ, বিদ্যেদিগ্‌গজ আবার কী! বি-কম্ পাস করেছি, আপিসে চাকরি করে খাচ্ছি! তাছাড়া ওঁকে আমি ঠিক চিনি না, আমার বন্ধু মুকুন্দ ওঁর সেক্রেটারি, তার সঙ্গেই সব কথা হয়ে গেছে। বটুকেশ্বর নন্দী আপনার ছেলের মতোই কাউকে খুঁজছেন। অবিশ্যি আপনাদের যদি এতেও আপত্তি থাকে, তবে থাকগে—'

বাবা বললেন, 'আহা, চট কেন, একটু ঠাট্টাও বোঝ না? কী আর আপত্তি থাকতে পারে আমাদের, বিশেষ করে এবারের অঙ্কের পরীক্ষায় যখন—' এই বলে আমার দিকে এমনি কটমট করে তাকালেন যে, কারো বুঝতে বাকি রইল না অঙ্কের পরীক্ষায় কত নম্বর পেয়েছি।

মোট কথা, সেজোমামার সঙ্গে সত্যিই কার্সিয়াং গেলাম। একটা নতুন গরম গেঞ্জি, একজোড়া গরম মোজা, বড়োমামার ছেলে লেবুদার ছোটো হয়ে যাওয়া গোটা দুই গরম কোট, প্যান্ট, আমার নিজের সোয়েটার দুটো আর বলা বাহুল্য প্রচুর অঙ্কের বই খাতা সঙ্গে গেল। ট্রেন ছাড়ার সময় বইয়ের বান্ডিল দেখে সেজোমামার চক্ষুস্থির। বাবাকে বললে, 'আরে, অঙ্কের বিশারদের কাছে যাচ্ছে, অঙ্কের যাবতীয় বই তিনি গুলে খেয়েছেন, আবার অত বই কেন? বলেছি না নতুন প্রক্রিয়াতে উনি অঙ্ক শেখাচ্ছেন, বই-ফই লাগবে না।'

বাবা কাষ্ঠহাসি হেসে বললেন, 'বটুকেশ্বর তো আর তোমার ভাগ্নেকে দেখেনি।'

সেজোমামা বিরক্ত হয়ে বলল, 'কিছুই খবর রাখেন না, জাম্বু, বটুকেশ্বর আনকোরা কাঁচা জমিই চান, যেখানে ভুল শেখানোর চাষ হয়নি।' কিন্তু বাবা নাছোড়বান্দা!

ট্রেন ছাড়তেই সেজোমামা বলল, 'ঠাট্টা নয়, বটুকেশ্বর নন্দী একটা জিনিয়াস্; জিনিয়াস্ কেন, একটা ম্যাজিসিয়ানও বলা চলে। অঙ্কের জাদুকর। না করতে পারেন হেন জিনিস নেই। দেখে অবাক হয়ে যাবি। অঙ্কে কত পেয়েছিস?'

মুখ ঘুরিয়ে নিলাম।— 'এগারো।'

'বাঃ, বাঃ! হাফ ইয়ার্লিতে?'

'তেরো।'

'ভেরি গুড্, ভেরি গুড্! এইরকম জমি চাষের উপযুক্ত। কুড়ি দিনে ভোল্ কেমন ফিরে যায় দেখিস।'

আমার মুখ তাই শুনে তোলো হাঁড়ি।

'বেড়াতে এসেছি, কুড়ি দিন ধরেই অঙ্ক কষতে হবে নাকি?'

সেজোমামা একগাল হাসল। 'না রে না; তাহলে আর জাদুকর বলছি কেন। একদিনও কষতে হবে না। বই নিয়ে বটুকেশ্বরের ছায়াও মাড়াতে হবে না। সাবধান, যখন-তখন ওঁর আশেপাশে খাতা নিয়ে যেন ঘুরঘুর করিস না, জিনিয়াসের মাথার ঠিক থাকে না, শেষটা কী হতে কী হয়ে না যায়! কই, লুচি কাটলেট বের কর। সেই কখন দু-ঘণ্টা আগে চাট্টি ঝোল ভাত খেয়ে বেরিয়েছি। তোর খিদে পায়নি?'

টিফিন ক্যারিয়ার খুলতে খুলতে বললাম, 'হুঁম্।'

'হুম্ আবার কী? বললাম না উনি একটি সাক্ষাৎ জাদুকর, তোকে অঙ্কের পণ্ডিত করে দিতে ওঁর ঠিক আধ মিনিট সময় লাগবে, অবিশ্যি একটা মেসিনও লাগবে।'

শুনে এমনি চমকে গেলাম যে একসঙ্গে দুটো লুচি আর একটা গোটা কাটলেট মুখে পুরে কিছুক্ষণ অজগর সাপ! সেগুলো গেলা হলে ভয়ে ভয়ে বললাম, 'মেসিন দিয়ে? অঙ্কগুলো রাইট হবে তো? মানে মাঝখানটা ভুল হলে ম্যানেজ করে নিতে পারব, কিন্তু উত্তরটা মিলবে তো?' সেজোমামা আকাশ থেকে পড়লেন, 'সে আবার কী? মেসিনের কখনো ভুল হয় নাকি? গোড়া, মধ্যিখান, শেষ, সব রাইট হবে।' টপটপ করে সেজোমামা তিন-চারটে মালপো খেয়ে নিল।

আমি বললাম— 'কিন্তু—'

'কিন্তু আবার কী? তবে কি আমাকে বিশ্বাস করিস না? কেন, নিয়ে যাইনি তোকে চাঁদে?'

এরপর আর বেশি কিছু বলাটা ঠিক মনে হল না। চারদিকের দৃশ্য দেখতে দেখতে খেতে খেতে আর ঘুমোতে ঘুমোতে কার্সিয়াং পৌঁছে গেলাম।

এ রকম জায়গা আমি কখনো দেখিনি। একদিকে খাড়া পাহাড়, তার পেছনে হিমালয়; অন্যদিকে গভীর খাদ, দূরে সমান জায়গার মধ্য দিয়ে তিরতির করে পাঁচটা নদী বয়ে যাচ্ছে। রেলের লাইনের অনেক নীচে পাহাড়ের গায়ে দুটো কাঠের বাড়ি, উঠি-কট্ আর পড়ি-কট্। আমরা থাকি উঠি-কটে।

কী সুন্দর বাড়ি সে আর কী বলব। বড়ো বড়ো কাঠের টবে নানা রঙের ফুল ফুটেছে, পাশাপাশি দুটি ঘর, একফালি বারান্দা, সামনে এক চিলতে বাগান। ঘরে স্প্রিং দেওয়া খাটে নরম বিছানা আর সাঁইলা বলে চাকরটা কী চমৎকার মুরগি রাঁধে সে আর কী বলব। তবু মনে বড়ো ভাবনা; সেজোমামাকে জিজ্ঞেস করলাম— 'মেসিন দিয়ে অঙ্ক শিখলে ব্যথা লাগে না তো?' সেজোমামা রেগে গিয়ে কী বলতে যাবে, এমন সময় সাঁইলা গরম গরম ডিম দিয়ে রুটি ভেজে আনল। সেজোমামা নরম হয়ে বলল, 'ওই দ্যাখ্ পড়ি কট্, ওর কত বড়ো বাগান, চারদিকে দেড় মানুষ উঁচু পাঁচিল, যাতে বাইরের কেউ ঢুকতে না পারে আর ভেতরের কেউ পালাতে না পারে। বাগানে দ্যাখ্ ঝোপের মধ্যে ছোটো ছোটো ঘর, ওই সব ঘরে জন্তুজানোয়ারেরা থাকে, তাদের নিয়ে গবেষণা হয়।'

লাফিয়ে উঠলাম— 'অ্যাঁ! শেষটা কেটেকুটে মাইক্রোস্কোপের নীচে—'

সেজোমামা রেগেমেগে বাকি তিনটে রুটিভাজার মধ্যে বড়ো দুটোকেই খেয়ে ফেলল।— 'তোর যেমন বুদ্ধি! কাটবেন কেন, অঙ্ক শেখান।' আমার হাত থেকে অন্য রুটিটা পড়ে গেল আর সাঁইলার ভুটিয়া কুকুর টেঁপি অমনি সেটাকে মুখে তুলে দে ছুট।

সেজোমামা বললেন, 'হ্যাঁ, ওখানকার কাগরাও তোর চেয়ে ঢের বেশি অঙ্ক জানে। মুশকিল হচ্ছে তারা লিখতে পারে না, তা ছাড়া সমস্ত ছাপ নেবার পক্ষে ওদের মগজগুলো বড্ড ছোটো। মোট কথা একজন বারো-তেরো বছরের অঙ্ক-না-জানা মানুষ ওঁদের দরকার। পাওয়া বড়ো শক্ত, সবাই কিছু-না-কিছু জানে। তাই তোকে আনা, পরীক্ষার স্পেসিমেন চাই ওদের। তাই বিনি পয়সায় এমনি ভালো বাড়ি, রোজ ফ্রি ভোজ— ওরে সাঁইলা, রাতে পরোটা কাবাব হচ্ছে তো, শুধু একজনের মতো কিন্তু, দাদাবাবু খাঁচায় যাবে।' আমার হাত পা ঠান্ডা। খাঁচায় আবার কী? ক্যাঁচ করে গেট খুলে গলাবন্ধ ছককাটা গরম কোট, হাঁটুর কাছে বগলেস আঁটা পেন্টেলুন, কদমছাঁট চুল, একটা লোক এসে বারান্দায় উঠল।

'আরে মুকুন্দ যে, এসো, এসো।'

মুকুন্দবাবু আমার মাথা থেকে পা অবধি ভালো করে দেখে নিয়ে বললেন, 'এই নাকি স্পেসিমেন? নুন মাখানোর কথা বলা হয়েছে?'

আমি হাত পা ছুঁড়ে পালাবার চেষ্টা করলাম। সেজোমামা শক্ত করে কনুইটা ধরে বলল, 'কী জ্বালা! মেসিনে দেবার আগে নুন মাখাতে হবে না?'

মুকুন্দবাবু বললেন, 'নুনে আপত্তি থাকলে কস্টিক— নাঃ, কচি মাংস, নুনই ভালো। ওহে তোমার কোনো ভয় নেই, নুনই দেব। কী হে, বেশি চালাক নয় তো? তা হলে চলবে না।'

'না, না, আমার একটা আক্কেল আছে তো। হাপইয়ার্লিতে ১৩, এবারে ১১। তাও শুনলাম পক্ষপাতিত্ব করে; ওর বাবার কাছে টাকা ধারে কিনা। এত কথা আমিও জানতাম না। কিন্তু তোমার এরকম পোশাক কেন, মুকুন্দ?'

'এ নইলে চলে না। চুল থাকলে, আমার বুদ্ধির দৌড় দেখে বাঁদররা চুল টেনে কান মলে একাকার করে। কানঢাকা পড়তে হয়। কী হে ছোকরা, তুমি হলে আমাদের স্পেসিমেন ৫০১; তোমার আগে ৫০০টা গেছে কোনোটা সম্পূর্ণ সাক্সেস্ফুল হয়নি। তোমার উপর অনেক আশা। তাই সব চেয়ে

ভালো ঘরে থাকা, ভালো খাওয়া, রেডিয়ো, কমিক, সব ব্যবস্থা করা হয়েছে। এমনকী মন ভালো রাখার জন্য অন্য স্পেসিমেনদের মধ্যে থেকে একজন সঙ্গীও দেওয়া যেতে পারে।'

সেজোমামা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'না হে মুকুন্দ তাতে কাজ নেই, ঘাঁটিয়ে কী হবে, বরং ঢেঁপি সঙ্গে যাক।' আঃ, বাঁচা গেল, ঢেঁপি আমাকে খুব ভালোবাসে, সারাদিন আমার খাটে আমার লেপের নীচে শুয়েছিল। আমার মাথার কোঁকড়া চুলের সঙ্গে ওর নিজের গায়ের কোঁকড়া লোমের সাদৃশ্য দেখে বোধহয় আমাকে স্বজাতি ঠাউরেছিল!

মুকুন্দবাবু উঠে পড়লেন। 'চলি এখন, রাতে মাস্টারমশাই একবার স্পেসিমেন দেখতে আসবেন।'

মুকুন্দবাবু চলে গেলে আমি বললাম, 'থাক্‌গে সেজোমামা, খাঁচায় ঢেঁপির কষ্ট হবে, আমি বরং তোমার কাছেই অঙ্ক অভ্যাস করি।'

সেজোমামা কেন যেন খিঁচড়েই ছিল, তেড়িয়া হয়ে বলল, 'আমার কাছে? আমি কি অঙ্ক জানি নাকি? বিয়োগ পর্যন্ত কষতে পারি না, সেটা ভুলে গেছিস? তা ছাড়া এখন টু-লেট, খাতায় তোমার নাম উঠে গেছে, এখন তুমি আমাদের কেউ নও, ওঁদের স্পেসিমেন ৫০১। তা ছাড়া আগাম টাকা দিয়ে এই কোর্টটা কিনেছি, এখন আর নড়চড় হয় না। আপত্তিটা কীসের তা তো বুঝলাম না, লাগবেও না একটুও, নাকি ঘুম পাড়িয়ে, গভীর রাতে মেসিন দেওয়া হয়, স্পেসিমেন টেরও পায় না। শুধু—'

'কী শুধু, সেজোমামা?' কিন্তু সেটা আর শোনা হল না, কারণ মুকুন্দবাবুর সঙ্গে স্বয়ং বটুকেশ্বর এসে উপস্থিত হলেন! পাকা চুল দাড়ি, অবিশ্যি মঙ্কিক্যাপ দিয়ে ঢাকা, অবিকল মুকুন্দবাবুর মতো পোশাক। আমার দিকে চেয়ে হেসে বললেন, 'ছক্ কাটা পোশাক দেখে অবাক হচ্ছ নাকি? জানো না ছকের দিকে খানিকক্ষণ তাকালে একটা হিপ্‌নটিক ভাব হয়, স্পেসিমেনের আপত্তি করবার কোনো ইচ্ছাই থাকে না। যাই হোক, তোমার কোনো ভয় নেই, কাল সকালে উঠে দেখবে আমার সমান অঙ্ক জান।'

ভাঙা গলায় বললাম, 'কী করে?'

'ওমা, মুকুন্দ বলেনি বুঝি? শোনো তবে। মানুষের মগজে উঁচুনীচু হঁকড়িমিকড়ি থাকে ছবিতে দেখেছ তো? ওইগুলোই জ্ঞানবিদ্যের দাগ। কোনো উপায়ে ওগুলো মুছে গেলে জ্ঞানবিদ্যেও খতম। আবার তেমনি যদি কোনো কৃত্রিম উপায়ে মগজের উপর ওইরকম উঁচুনীচু খাঁজ ভাঁজ করে দেওয়া যায়, আপনা থেকেই জ্ঞানবিদ্যে গজিয়ে যায়, বই পড়তেও হয় না। তিরিশ বছরের গবেষণার ফলে আমার মগজের ইলেকট্রনিক ফোটো তুলতে পেরেছি, তার হুবহু নকল করার যন্ত্রও আবিষ্কার করেছি। সেই যন্ত্র দিয়ে তোমার মগজে পাঁচ সেকেন্ড বৈদ্যুতিক ঢেউ চালালেই ব্যস, আমি যত অঙ্ক জানি, তুমিও ততই জানবে। আমার যা শিখতে পঞ্চাশ বছর কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। তখন তোমার অঙ্কের মেডেল ঠেকায় কে!'

আমি বললাম, 'ও, বুঝেছি, অনেকটা গ্রামোফোন রেকর্ডের ব্যাপার!'

ধুরন্ধরের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সেজোমামাকে বললেন, 'অ্যাঁ! বড়ো বেশি বুদ্ধি মনে হচ্ছে যে!'

সেজোমামা বলল, 'না, না, ওটা আপনার মনের ভুল। এই ব্যাটা, চারের বর্গ কত?'

বললাম, 'আট।'

ধুরন্ধরের মুখে হাসি ফুটল।

'দুটো বিন্দুর মধ্যে সব থেকে ছোটো লাইন কী হতে পারে?'

আমি বললাম, 'পাহাড় ফুঁড়ে টানেল দিয়ে।'

ধুরন্ধর উঠে পড়ে, আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, 'বাঃ ভেরি গুড্, ভেরি গুড্।'

মুকুন্দবাবু ওঁকে রওনা করিয়ে দিয়ে ফিরে এসে বললেন, 'মাস্টারমশাই বলছেন শুভকাজে দেরি করতে নেই, কাল রাতেই হয়ে যাক। কী বলো হে?'

আমি বললাম, 'রাতে আমার ঘুম পায়, সকালে হোক।'

মুকুন্দবাবু বিরক্ত হয়ে উঠলেন, 'বলছি ঘুমন্ত অবস্থায়ই সবচেয়ে ভালো, স্পেসিমেন কোনো আপত্তি করার আগেই মেসিন লেগে যায়। তা ছাড়া পইপই করে বলছি সকালে ওঁকে ঘাঁটিয়ো না, উনি প্রকৃতিস্থ থাকেন না।'

লাফিয়ে উঠলাম, 'অ্যাঁ, তবে কি পাগল নাকি? থাক্ বাবা, আমি না হয় এই ক্লাসেই আরেক বছর—'

মেজোমামা ধমকে উঠল। —'থাম্ দিকিনি। কোন মহাপুরুষ কবে প্রকৃতিস্থ ছিলেন সেটা আগে বল্। রবীন্দ্রনাথ কি প্রকৃতিস্থ ছিলেন? তা হলেই নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন আর কী! জগদীশ বোস, পি. সি. রায়, এঁরা প্রকৃতিস্থ ছিলেন বলতে চাস? তা হলেই বিজ্ঞানের অগ্রসর হয়েছিল আর কী! প্রকৃতিস্থ মানে তোমার বাবার মতো, তিনি সারা জীবনে করেছেনটা কী, তা শুনতে পারি?'

মুকুন্দবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'আহা, এই সামান্য বিষয় নিয়ে অত রক্ত গরম করার কী আছে? না-হয় সন্ধ্যের দিকেই কাল সময় করা যাক, তখন ওঁর ঘোর কেটে যেতে শুরু করে। এটুকু তোমায় করতে হবে ভাই। তোমার জন্য মাস্টারমশাই ট্র্যান্‌জিস্টর উপহার কিনেছেন; চামড়ার বাক্সে বাইনাকুলার কিনেছেন; সেই বাইনাকুলার হাতে নিয়ে—'

আমি বললাম, 'কাল কেন, আজ রাতেই হোক না তাহলে। ট্র্যান্‌জিস্টরটা কি খাঁচার মধ্যেই আছে?'

সেজোমামা শেষ মুহূর্তে বাগড়া দিতে চাইছিল; আর কেউ কিছু পাক, সেটা বোধ হয় পছন্দ হচ্ছিল না। আমি কিন্তু পরদিন সকালে যাওয়ার কথা ঠিক করে ফেললাম। মুকুন্দবাবু চলে গেলে সেজোমামা বলল, 'ওরে, থাক্‌গে না-হয় ওসব পাগলের যন্ত্রপাতি। আমিই বরং তোকে—'

বললাম, 'তা হলেই হয়েছে! তুমি না বিয়োগ করতে পার না! তা ছাড়া আমাকে ট্র্যান্‌জিস্টারই বা দিচ্ছে কে? তোমাকেও তাহলে এ বাড়ির আরাম ছেড়ে আবার সেই ধেড়ধেড়ে গোবিন্দপুর ফিরে যেতে হবে।'

রাতে সেজোমামার সঙ্গে পরোটা কাবাবের সদ্‌ব্যবহার করে সারারাত ঘুম লাগালাম। সেজোমামা বোধ হয় অনেকক্ষণ বারান্দায় পাইচারি করেছিল। পরদিন ভোরে এক গাদা চিকেন প্যাটি নিয়ে মুকুন্দবাবু এলেন, একসঙ্গে চা খেয়ে টেঁপিকে নিয়ে ওঁর সঙ্গে পড়িকটের পেছনের ফটক দিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। দেখলাম বাগানে ওগুলো খাঁচা নয়, ছোটো ছোটো ঘর, সামনে বারান্দা, সবসুদ্ধ জাল দিয়ে ঘেরা। প্রত্যেকটাতে একটা করে জানোয়ার কিম্বা পাখি। টেঁপি চেঁচিয়ে মেচিয়ে একাকার।

একটা পাতিহাঁস দেখলাম ডানা নেড়ে গাছ দেখাচ্ছে, মুকুন্দবাবু বললেন নাকি গাছ গুণছে, বন-বিভাগে চাকরি নিতে পারে, ইচ্ছা করলেই। একটা বাঁদর খড়ি দিয়ে মাটিতে দাগ কাটছে, নাকি খুব বড়ো পণ্ডিত; দুঃখের বিষয়, অঙ্ক শিখেছে দেদার কিন্তু লিখতেও পারে না, আঁকতেও পারে না, কথাও বলতে পারে না। এই হয়েছে মুশকিল, নইলে অঙ্ক জগতে তাক্ লাগাতে পারত। 'বিখ্যাত ডে-কার্টের ব্রেনের নকল। স্— স্— স্ কথা বোলো না, ওরা ডিস্টার্বড্ হবে। মহা গোলমাল করবে, প্রতিভাবান কি না।'

সব চেয়ে বড়ো ও ভালো ঘরটা আমার জন্য তৈরি। নরম বিছানা, গল্পের বই, চকোলেট, বিস্কুট ইত্যাদি, তা ছাড়া ব্রাউন কাগজে মোড়া ট্র্যান্‌জিস্টর, বাইনাকুলার, তার উপর কার্ডে আমার নাম লেখা।

ঢেঁপি প্রথমটা একটু গোলমাল করেছিল, তারপর প্রচুর চকোলেট বিস্কুট খেয়ে আহ্লাদে আটখানা। সারাদিন রেডিয়ো চালিয়ে, বাইনাকুলার দিয়ে দূরের চা-বাগান আর পর্বত দেখে আর ভালো খাবার খেয়ে কাটালাম। কী সব খাবার, মাখন দিয়ে মুরগি ভাজা, তিতির রোস্ট, আইসক্রিম, এইসব। আমি যা খেলাম, ঢেঁপিও তাই খেল। মাঝে মাঝেই মুকুন্দবাবু এসে খোঁজখবর নিয়ে গেলেন। বটুকেশ্বরবাবুর টিকিও দেখলাম না। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর আরাম করে ঢেঁপি আর আমি শুয়ে পড়লাম। তখনো বাঁদরটার ঘরে আলো জ্বলছে।

শেষ রাতে বিকট চ্যাঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেল, ঢেঁপি সবচেয়ে বেশি চিৎকার করছে, সমস্ত পাখি জানোয়াররাও যোগ দিচ্ছে, সাংঘাতিক কিছু একটা হচ্ছে বুঝলাম। আমি কি আর সেখানে থাকি। তাড়াতাড়ি কাপড় চোপড় পরে নিয়ে, পায়ে জুতো গলিয়ে, ট্রান্‌জিস্টার, বাইনোকুলার আর ঢেঁপিকে নিয়ে, খিড়কিদোর খুলে একেবারে উঠি-কট! মাঝ পথেই সেজোমামার সঙ্গে দেখা, এক হাতে টর্চ, এক হাতে চ্যালাকাঠ। আমাকে দেখে একেবারে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। সটাং উঠি-কটে ফিরে দরজা এঁটে, তবে নিশ্চিন্ত। পড়ি-কটে আলো জ্বলছে, গোলমাল আস্তে আস্তে কমে, সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল। সেজোমামা বলল, 'এখানকার বাস বোধ হয় তুলতে হল।'

চায়ের আগেই মুকুন্দবাবু এসে উপস্থিত, আমাকে দেখেই বললে, 'শূন্যকে কত দিয়ে গুণ করলে অসীমের সমান হয়?'

আমি বললাম, 'ধেৎ!'

মুকুন্দবাবু বললেন, 'চারের বর্গ কত?'

আমি বললাম, 'আট। কালকেই তো বলেছি।'

মুকুন্দবাবু মূর্ছা গেলেন। তাঁর মুখে মাথায় জলের ছিটে দিতেই সুস্থ হয়ে উঠে বসে বললেন, 'মাস্টারমশাইয়ের হাত থেকে মেসিন পড়ে চুরমার, খালি বলছেন, শক্তি বেশি দিয়ে ফেলেছেন, স্পেসিমেনের সর্বাঙ্গে লোম বেরিয়েছে, মগজে কী হয়েছে কে জানে! আমাকে ঠেকাতে বলে ফরাক্কাবাদ গেছেন ওঁর গুরুদেবের আশ্রমে। কত টাকা দিতে হবে জানতে চেয়েছেন। কিন্তু স্পেসিমেনের তো কোনো পরিবর্তন হয়নি, মেসিন ফেল করল কিনা কে জানে।'

এমন সময় ঢেঁপির কুঁই কুঁই শুনে সবাই তাকিয়ে গুণিতক বের করছে। মুকুন্দবাবু তো অবাক, সেজোমামা হাঁ!

আমি বললাম, 'এক হতে পারে আমি তো বালিশে মাথা রাখি না, উলটো দিকে মাথা দিয়েছিলাম, ঢেঁপি বালিশে মাথা দিয়ে শুয়েছিল, তাই ওকেই—'

মুকুন্দবাবু আর সেজোমামা হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠলেন। মোটের ওপর বাকি উনিশটা দিন খেয়ে-দেয়ে ভালোই কেটেছিল। শুধু সারা দুপুর না ঘুমিয়ে অঙ্ক কষতে হত, কারণ সেজোমামা ট্রান্‌জিস্টর আর বাইনোকুলার বন্ধ করে রেখেছিলেন, যত দিন না অঙ্কের বইগুলো মুকুন্দবাবুর সাহায্যে মুখস্থ করে ফেললাম। বলা বাহুল্য অ্যানুয়েলে অঙ্কে ৬০ পেলাম! বাবা সেজোমামাকে রেস্তোরাঁয় খাওয়ালেন আর মুকুন্দবাবুকে আমাদের ইস্কুলের অঙ্কের স্যার চলে গেলে হেডমাস্টারমশাইকে বলে সেইখানে বহাল করিয়ে দিলেন।

নোকোসি

সেজো দাদু চেয়ারের উপরে পা গুটিয়ে বসে বললেন, 'নেই বললেই নেই? যেই তোরা দরজা ভেজিয়ে নীচে চলে যাবি অমনি সে ম্যাও ম্যাও করতে করতে কিছুর পিছন থেকে বেরিয়ে এসে আমার পায়ে গা না ঘষে তো কী বলেছি। ভালো করে খুঁজে দ্যাখ, সে তো আর কর্পূর নয় যে উবে যাবে। বাবা! খায় কম? আমার দেড়া গেলে অথচ দেখতে তো ওইটুকু!

মিনু ফোঁচ ফোঁচ করে খানিকটা কেঁদে নিয়ে বলল, 'খালি খালি পুষুমণিকে চোখ দিয়ো না বলছি, খায় তো চাট্টিখানিক পাতকুড়ুনি, শোয় ছাইয়ের গাদায়, ও বেচারির উপরে তোমার অত রাগ কেন শুনি?'

ট্যাঙস বললে, 'রাগ নয়, রাগ নয়, স্রেফ ভয়। বেড়াল দেখলে বুড়োর চুল দাড়ি খাড়া হয়ে ওঠে।'

আমাদের পুরোনো চাকর ভজুদা সেজো দাদুর সঙ্গে নাকি খেলা করত, সে খাটের তলাটা ঝাঁটা দিয়ে খোঁচাতে খোঁচাতে বললে, 'ভারি ভীতু, সেজো দাদাবাবু।'

সেজো দাদু শুনে চটে কাঁই।

'হতে পারি তোদের কাছে ভীতু, কিন্তু যেদিন নোকোসির লুকানো ঐশ্বর্য উদ্ধার করতে নেমেছিলাম সেদিন কেউ আমাকে ভীতু বলেনি! দুনিয়ারি এই দস্তুর, আজ যাকে বীরত্বের জন্যে লাটবাহাদুর সনদ্ দেয়, কাল তাকে নিয়ে নাতিনাতনিরা হাসাহাসি করে— ঈ-ঈ-ক্!'

অমনি আমরা হুড়মুড় করে তাঁকে ঘিরে ফেললাম— 'কী হল? কী হল, সেজোদাদু? ওরকম করছ কেন, নোকোসির ঐশ্বর্যের কথা বলবে না?'

মিনু নাকিসুরে বললে, 'সব চালাকি। বেড়াল নেই, কিচ্ছু নেই, শুধু গল্প না-বলার ফন্দি!'

সেজোদাদু ঢোক গিলে চেয়ারের হাতলে চড়ে বসে বললেন— 'বেড়াল নেই তো কে আমার কনুইয়ে সুড়সুড়ি দিল?'

ট্যাঙস বললে, 'আমি গো, আমি। ইচ্ছে করে দিইনি, ভালো করে গল্প শুনব বলে এগিয়ে যেতে গিয়ে, ওইখেনে মুণ্ডুটা একটু ঘষে গিয়েছিল!'

ঠিক এমনি সময় ম্যাও!— বলে এক বিকট চিৎকার করে হলদে বিদ্যুতের ঝলকের মতো পুষুমণি বইয়ের আলমারির মাথা থেকে এক লাফে নেমেই দে ছুট!

শোঁ-ও-ও করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে, চোখের পলক না ফেলতে একতলার উঠোনে ভজুদার বউ যেখানে মাছ কুটতে বসছে, সেখানে গিয়ে উপস্থিত। ওখান থেকে যে সহজে নড়বে না সেটা জানা কথা।

দরজা ভেজিয়ে সেজোদাদুকে ঘিরে বসা হল। 'বলো শিগ্‌গির, নইলে আবার ডেকে আনব।' সেজোদাদু একটুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বললেন, 'ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিটে পুরোনো কলিনোর আপিসে গেছিস কখনো? আশ্চর্য সে জায়গা, মিনে করা মেজে, হঠাৎ দেখলে মনে হয় বুঝি গালিচে পাতা, একতলা থেকে তিনতলা অবধি পেতলের থাম, তার মাথায় লাল রং ছাই রং সোনালি রং দিয়ে সে যে কী চমৎকার নক্‌শা করা। থামের গায়ে চুনকাম করা বটে কিন্তু হঠাৎ যদি আচমকা কেউ একটা কাগজ চাপা দিয়ে ঠুং করে মারে অমনি মেঝে থেকে ছাদ অবধি ঝনঝন করে বেজে ওঠে। ওটা ছিল এককালে সিরাজউদ্দৌলার নাচঘর। একদিকের দেয়ালে সারি সারি প্রকাণ্ড আয়না ঝুলছে, এককালে সে আয়নাতে নবাব বেগম সাহেব বিবিদের ছায়া পড়ত।'

এই অবধি বলে গল্প থামিয়ে সেজোদাদু কেমন যেন শিউরে উঠলেন। আমরা ব্যস্ত হয়ে খাটের তলায়, বইয়ের আলমারির কোনায় দেখে নিলাম, কোথাও কিচ্ছু নেই।

ট্যাঙস বললে, 'সবটাতে তোমার ইয়ে, বেড়াল নেই তো আবার ভয়টয় কীসের?'

সেজোদাদু বললেন, 'ভয়? না ঠিক ভয় নয়, তবে পাঁচটার পর আর ওই হল ঘরটাতে কেউ থাকতে চাইত না। কোনোরকমে কাজকর্ম শেষ করে, গাছের ছায়া লম্বা হয়ে আসবার আগেই সবাই কাগজপত্র গুটিয়ে রেখে কেটে পড়ত। সঙ্গে সঙ্গে জায়গাটিও কেমন অন্য রকম হয়ে যেত। বাইরের রাস্তার হাজার গাড়ির ঘড়ঘড়ানি আর শোনা যেত না।'

'হলঘরের পিছনে কাঠের সিঁড়ি, সেকালের মেহগিনি কাঠ, পেকে একেবারে লোহার মতো শক্ত হয়ে উঠেছে, তার গায়ে একটি পেরেক ঠোকা দায়। পুজোর ছুটিতে সবাই মিলে দল বেঁধে ঝাড়গ্রাম যাওয়া হবে। পানু— আমার ভাগ্নে পানুকে জানিস তো; সেখানে এখন থেকেই মুরগি জমা করছে, অথচ কাজ শেষ করে দিতে না পারলে আমার যাবার জো নেই। আমাদের বড়ো সাহেব তো মানুষ ছিল না, স্রেফ একটি কালো চিতাবাঘ, তেমনি নিঃশব্দ, তেমনি হালকা, তেমনি কালো, তেমনি গন্‌গনে হলুদ চোখ। উঃফ্! নিঃশব্দে পিছনে এসে দাঁড়ালে গলায় যেই একটু নরম নিশ্বাস পড়েছে আর অমনি আমার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়েছে! ট্যাঙস বললে, 'আহা, আমার তো একটা ম্যাও শুনলেই হাতে পায়ে খিল ধরে!' সেজোদাদু চটেমটে উঠে যান আর কী? সবাই মিলে গাঁট্টা মেরে ট্যাঙসকে থামানো হল। সেজোদাদু বললেন, 'তাই রোজই একটু করে দেরি হয়ে যেতে লাগল। সবাই চলে যায়, আমি একে সাধি ওকে সাধি, পান খাওয়াই, পকেটে করে ভেজিটেবল চপ নিয়ে যাই, একটু যদি কেউ থাকে যায়। এমনিতেই আলো জ্বালবার পর থেকেই গা ছমছম করতে থাকে; এতটুকু শব্দ হতেই ঘরময় প্রতিধ্বনি ওঠে, সে যে কী বিশ্রী ব্যাপার সে তোরা ভাবতে পারিস নে।'

'বড়ো সাহেবের পেয়ারের কেরানি নোকোসি কোন দিশি লোক তা কেউ জানে না। গায়ের রং তামাটে, হলুদ বাঁকা চোখ, খাঁদা নাক, পাতলা গরগরে শরীর, সাদা খাটো শার্ট পেন্টলুন আর সাদা ক্যাম্বিশের জুতো পরে আর অষ্ট প্রহর ফস্ ফস্ করে বড়ো সাহেবের ঘরে গিয়ে কান ভাঙানি দেয়। কবে টিপিনের সময় কে কী বলেছে, কে কোথায় কী গোঁজামিল দিয়েছে, সব গিয়ে লাগাবে। ফলে এর ছুটি কাটা যায়, ওর প্রমোশন বন্ধ হয়। বুঝতেই তো পাচ্ছিস আপিসসুদ্ধ লোক ওর উপর কীরকম হাড়েচটা ছিল। আমি বেশি ঘাঁটাতাম না, গড় গড় ইংরেজি বলত, কিন্তু পান খেতে খুব ভালোবাসত। মাঝেমাঝে বড়ো এক খিলি পান ওর হাতে গুঁজে দিয়ে খুশি রাখবার চেষ্টা করতাম ছুটিছাটার ব্যাপারে ওর যেরকম প্রতাপ!'

'তা ওই যা বলছিলাম মহালয়ার আগের দিন অবধি ফাইলের গন্ধমাদন নিয়ে পড়েছিলাম, সেদিন যত রাত্তির হোক আর যা থাকে কপালে বলে তাল ঠুকে লেগে গেলাম। কোনো দিকে হুঁশ নেই,

কাজ শেষ করতে রাত দশটা। চৌকিদারকে বলা আছে, সেও কি সহজে ভিতরে আসে, ঠায় বাইরে বসে রইল, আমি বেরুলে বাইরে থেকে তালা দেবে। থামের পিছনে নির্জন কোণে নিজের জায়গাটিতে কাজ সেরে যেই-না উঠে দাঁড়িয়ে গা মোড়ামুড়ি দিতে যাচ্ছি, সামনে তাকিয়ে গায়ের রক্ত হিম! দোতলার উঁচু গ্যালারির কাঠের সিঁড়ি দিয়ে মিশ কালো কী একটা নেমে আসছে!'

'কী আর বলব তোদের, আঁতকে উঠে নিজের জিভটাই আরেকটু হলে গিলে ফেলছিলাম! কান বোঁ বোঁ, মাথা ঘোরা, চোখে অন্ধকার দেখা কিছু আর বাকি রইল না! মিশ কালো চাপা গলায় এক ধমক দিয়ে বলল ওকি হচ্ছে চ্যাটার্জি, পা ল্যাগব্যাগ করছ কেন? এত রাত্রে এখানে কী হচ্ছেটা শুনি?'

'জ্যান্ত মানুষের গলা শুনে ধড়ে আমার প্রাণ ফিরে এল। বললাম, এই এতক্ষণে কাজ শেষ হল, কাল থেকে তেরো দিনের ছুটি শুরু, বাহবা কী মজা! কিন্তু তুমি এত রাত্তিরে কী মনে করে?'

বুঝতেই পাচ্ছিস ততক্ষণে তাকে আমার চিনতে বাকি নেই। সে নোকোসি। নোকোসি কাঠের সিঁড়ির একটা ধুলো ভরা ধাপে বসে পড়ে বললে, আমার সর্বনাশ হতে চলেছে।'

সে এমনি একটা হতাশ কণ্ঠে বলল আর চারদিক থেকে তার ফিসফিস কথার এমনি একটা খসখস মরমর প্রতিধ্বনি উঠতে লাগল যে আমি ভয়ে কাঠ! নোকোসি বললে, বোসো চ্যাটার্জি, আমার পাশে এইখানটিতে বসো। সত্যি কথা বলো, কখনো কী তোমার মনে হয়নি যে আমার মতো একটা লোক তোমাদের মতো সাধারণ লোকদের সঙ্গে এত মাখামাখি করি কেন, এইরকম একটা বাজে আপিসের থার্ড ক্লাস বড়ো সাহেবের দিনরাত খোসামুদি করি কেন?'

বললাম, 'সে আশ্চর্যটা কী, মাইনে বাড়াবার জন্যেই ওরকম করো।'

'সেই অন্ধকার ভুতুড়ে ঘরে নোকোসি চাপা গলায় অট্টহাস্য করে উঠল আর চারদিকের অন্ধকার থেকে তার যে বিকট প্রতিধ্বনি উঠতে লাগল সে না শুনলে বিশ্বাস করা যায় না। আমি নিজের অজান্তে ওর কাছ থেকে খানিকটা সরে বসলাম।'

'নোকোসি বজ্রমুঠিতে আমার হাতের কব্জি ধরে বলল, আজ ভগবান তোমাকে আমার হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন আজ আর তোমাকে ছাড়া নয়! কী বলব তোদের হাত-পা আমার পেটের ভেতর সিঁদিয়ে গেল; এর চেয়ে ভূত দেখা দিলে আর কী খারাপ হত? এখুনি হয়তো কোমরবন্ধ থেকে সরু লিক্‌লিকে ছোরা বেরুবে।'

'কিন্তু নোকোসি হঠাৎ আমার হাত ছেড়ে দিয়ে, পকেট থেকে ময়লা একটা কাগজের টুকরো বের করে আমাকে বললে, এই দলিলটা কোথায় বল।'

'দেখলাম তাতে দলিলের নম্বর লেখা রয়েছে এ ৫৫৭।কিউ১১।সি ডি ৩। বললাম, এ তো খুব শক্ত নয়, ও তো এ সেকশনের ৫৫৭ সংখ্যার সন্দেহজনক বিষয় সংক্রান্ত এগারো নম্বরের কন্‌ফিডেন্সেল ডকুমেন্ট তিন নম্বর। আজ ক-দিন ধরে তো ওই সেকশনেরই নম্বর মিলিয়ে আজ এইমাত্র শেষ করলাম। চল, উঠি। চৌকিদার তালা দেবার জন্য অপেক্ষা করছে।'

'নোকোসিকে সাবধান করে দেবার জন্যেই শেষ কথাগুলো বললাম। চৌকিদার অপেক্ষা করছে না হাতি! ছাপার খাটে শুয়ে ঠেসে ঘুম লাগাচ্ছে, ঠ্যাং ধরে না ঝাঁকালে জাগবে না। নোকোসির চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকমে জ্বলজ্বল করে উঠল। পকেট থেকে ভোঁতা একটা রিভলবার বের করে বলল— 'ওকি ট্যাঙস, পড়ে গেলি যে?'

ট্যাঙস উঠে বসে বলল, 'কেমন গা শিরশির কচ্ছিল বলে হাত ফসকে গেল।'

'থামছ কেন, নাও, নাও, বলো; এই কি থামবার সময় নাকি?' সেজোদাদু বলতে লাগলেন—

'দাঁতে দাঁত চেপে নোকোসি বললে, এতে সাইলেন্সার লাগানো আছে, একবার ঘোড়া টিপলে বাছাধনকে আর ভাবতে হবে না, এক্কেবারে সঙ্গে সঙ্গে ভবলীলা সাঙ্গ, টুঁ শব্দটি হবে না। শোনো, ওই দলিল আমার চাই, আমি এইজন্যেই এত রাত অবধি অপেক্ষা করে আছি, বাড়িতে গিন্নি মাংস-ভাত রেঁধে ঘন ঘন ঘড়ি দেখছেন, আর মেজাজ খারাপ করছেন, তবু বসে আছি। তার একমাত্র কারণ আমি বড়োসাহেবের কাছ থেকে শুনেছি, তুমি এই সেকশনে কাজ করবে অনেক রাত অবধি, চাবি তোমার কাছে থাকবে আন্দাজ করলাম। ইচ্ছে করলে এক্ষুনি এক থাপ্পড়ে চাবি কেড়ে নিতে পারি, কিন্তু চাবি পেলেও দলিল খুঁজে বের করা আমার কম্ম নয়। ভালোয় ভালোয় দেবে কিনা, বলো!'

'বলে নোকোসি খপ করে আমার ঘাড়ে চেপে ধরল। ঠিক ওইখানেই আমার বাতের ব্যথা, বেজায় লাগল। দারুণ রেগে হাত ঝেড়ে ফেলে বললাম, যদি না দিই, আমাকে গুলি করে মেরে ফেলবে এই তো? তা মারো-না গুলি, আমি ভয় পাই না!'

'তাই শুনে নোকোসি একেবারে কাঁদো কাঁদো হয়ে আমার পা ধরে বলল, আমাকে ক্ষমা করো ভাই, মনের দুঃখে কাকে কী বলেছি, ঠিক নেই! তোমাকে কি আমি মারতে পারি, তুমি আমার প্রাণের বন্ধু, তা ছাড়া ওটা খেলবার বন্দুক, মারলেও তোমার কিছু হবে না, কিন্তু দলিলটা না পেলে আমাদের সর্বনাশ হবে।'

বললাম, 'কেন?'

'নোকোসি বললে, সে আর বল না ভাই, ওতে আমার পূর্ব-পুরুষদের সঞ্চিত ধনরত্নের গুপ্তস্থানের রহস্য সাংকেতিক ভাষায় লেখা রয়েছে। নেবও না আমি, শুধু খানিকটা টুকে নেব। এতে তোমার কী আপত্তি থাকতে পারে, ভাই! বাড়িতে মা-বউ খেতে পাচ্ছে না, ছেলেটার মুখে ওষুধ দিতে পাচ্ছি না—'

বললাম, 'এই-না বললে, মাংস-ভাত রেঁধে বসে বসে রাগ-মাগ কচ্ছেন?'

'সব ধাপ্পা রে ভাই, দুঃখে-কষ্টে কি আর আমার মাথার কিছু ঠিক আছে? এককালে এই বাড়িতেই আমার পূর্বপুরুষরা নেমন্তন্ন খেতে আসতেন, এই ঘরে নাচতেন, এই আয়নায় তাঁদের ছায়া পড়ত, এখনও যেন মাঝে মাঝে দেখতে পাই— ও কী, উঠছ যে, সত্যি দেবে নাকি?'

'একগাল হেসে তড়াক করে নোকোসি লাফিয়ে উঠল। বুঝলি কিনা, ভয়কে আমি কেয়ার করি না। কিন্তু মানুষের দুঃখ কষ্ট সইতে পারি না। একটু টুকে নেবে বইতো নয়।'

'চাবি হাতে সটাং গেলাম ফাইলের তাকের পিছনে লোহার সিন্দুকের কাছে। পায়ে পায়ে নোকোসিও চলেছে, কানের উপর তার গরম নিশ্বাস পড়ছে, তার বুকের ধড়াস ধড়াস শুনতে পাচ্ছি, অবিশ্যি সেটা আমার বুকেরও হতে পারে।

'অন্ধকার নির্জন জায়গাটা, অন্ধকার আলমারির মাঝের গলি। এইতো সেই লকার। এরই মধ্যে না— চাবিসুদ্ধ হাত তুলেছি, এমনি সময় আলমারির মাথায় দুটো গনগনে চোখ জ্বলে উঠল! আর কি আমার জ্ঞান থাকে, এই বুঝি ম্যাও বলে লাফ দিল! বিকট একটা আকাশ ফাটানো চিৎকার দিয়েই একেবারে হাত-পা ছুঁড়ে মুচ্ছো!'

'সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে তাল তাল ফাইল পড়ল। চৌকিদাররা চার-পাঁচ জন খইনি খাচ্ছিল, মোটা মোটা লাঠি টর্চ নিয়ে তারা ছুটে এসে নোকোসিকে পাকড়াও করল।'

সেজোদাদু থামলেন। ট্যাঙস বলল, 'আঃ! বলো-না তারপর কী হল।'

'তারপর আবার কী হবে? নোকোসির চাকরি গেল।'

'বাঃ, জেলে গেল না?'

'জেলে যাবে কেন। কিছু তো নেয়নি বেচারি। আমিও বুদ্ধি করে চেপে গেলাম। বড়োসায়েব বললেন অসাধারণ সাহস দেখিয়ে লকার রক্ষা করেছি। নোকোসির পকেটে নাকি কোনো বড়ো মামলার সাক্ষী দলিলের নম্বর টোকা ছিল। আর চৌকিদার বলল— বজ্জাত বিল্লি এইখানে লুকিয়েছিল আর আমি খুঁজে খুঁজে হয়রান!'

একটু চুপ করে থেকে সেজোদাদু বললেন, 'সেই আমাকে তোরা আজ কাল ভীতু বলিস— ঈ-ঈ-ক্! ও ট্যাঙস, ও ভেদা, ও ন্যাড়া আমার পায়ে কী ঘষে গেল রে নরম গরম।'

এই বলে সেজোদাদু চেয়ারের উপরে পা তুলে নিলেন।

ট্যাঙস তবু বললে, 'ওসব রাখো এখন। বলো শিগ্‌গির লাটসাহেব তোমাকে কবে সনদ দিল!'

সেজোদাদু এক চোখ খাটের নীচে আর এক চোখ আলমারির মাথায় রেখে বললেন, 'আহা, আমাকেই দিয়েছিল তো আর বলিনি, তবে ও-রকম একটা দুঃসাহসিক কীর্তির পর সনদ দিলেও কিছু আশ্চর্য হবার ছিল না— দরজার পেছনে ওটা কীসের ল্যাজ না?'